



৪৭তম বর্ষ • ৩য় সংখ্যা • জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৬

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আমাদের কথা		
কেরালার গণিত ঘরানা	আশীষ লাহিড়ী	২
চিকিৎসায় স্পর্শ	সুগত দাশগুপ্ত	৪
যন্ত্রমেধার পাহারাদার	সোনাবুরি মৈত্র	৭
চলো পাল্টাই	শুভেন্দু দাশগুপ্ত	৯
লিমেরটিনিক	অনার্য মিত্র	১০
বর্ণবাদ	অরুণালোক ভট্টাচার্য	১১
গিগ কর্মী	শ্রীনিবাস মাধব (অনু: সমীরকুমার ঘোষ)	১৬
চন্দ্রাভিযান	শামীম হক মণ্ডল	১৮
সন্ন্যাসী প্রফুল্লচন্দ্র রায়	শ্যামল ভদ্র	২০
লালন কি জাত	দীপাবলি সেন	২৩
ডেটা সেন্টার	সিদ্ধার্থ সেন	২৪
প্রাচুর্যের মাণ্ডল	গৌতম মিস্ত্রী	২৭
অরণ্যের কার্বণ শোষণ	শান্তনু গুপ্ত	২৮
স্মার্ট মিটার	অমিতাভ নন্দী	৩১
চিঠিপত্র		৩২

রেজিস্টার্ড অফিস : বি ডি ৪৯৪ সল্টলেক, কলকাতা- ৬৪
 কার্যালয় : খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন বি ৪, এস - ৩,
 পোঃ- (আর) গোপালপুর নারায়ণপুর কলকাতা- ৭০০১৩৬
 ফোন : ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৮৯০২৪১২২৯০/৮৭৭৭০৬৬৪৭২

ওয়েবসাইট: www.utsomanush.com/
 ই-মেল: utsamanush1980@gmail.com
 ফেসবুক: <http://www.facebook.com/utsomanush/>

ISSN 0971-5800/RN.37375/80

আমাদের কথা

রাজ্যে সরকার বদল হল। নতুন সরকার আমাদের মতো পত্রিকার জন্য কতটা ভাল, কতটা মন্দ তা সময়ই বলবে। তবে আশা করতে ক্ষতি কী? উৎস মানুষ আগাগোড়া কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, সামাজিক ও ধর্মীয় গোঁড়ামি-র কড়া সমালোচক এবং সেই রাস্তা ধরেই এগোবে তাতে নতুন সরকার বাদ সাধবে না। আমরা নতুন সরকারের কাছে এই আবেদন রাখব বিজ্ঞানের নামে যেন অপবিজ্ঞানকে প্রশ্রয় না দেওয়া হয়, যেমনটা ত্রিপুরায় হয়েছে। সে রাজ্যে ক্লাস সেভেনের গণিত বইয়ের প্রচ্ছদে নবগ্রহ-র যে ছবি দেওয়া হয়েছে তাতে রাছ কেতু ঢুকে পড়েছে। সূর্য, চন্দ্র, বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি এই সাতটি জ্যোতিষ্ক এবং রাছ ও কেতু, মোট ন'টি। এইভাবে জ্যোতিষশাস্ত্রে নবগ্রহের জন্ম। এর ওপর ভিত্তি করেই জ্যোতিষীরা আজও জন্মপত্রিকা তৈরি করে চলেছেন। আমরা জানি রাছ ও কেতু হল মহাকাশে দুটি কাল্পনিক বিন্দুমাত্র, গ্রহ নয়। ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো জ্যোতিষীদের ধর্তব্যের মধ্যেই আসে না। এই দারুণ ভুলের ওপর ভিত্তি করেই দাঁড়িয়ে আছে জ্যোতিষশাস্ত্র। নতুন সরকার আর জি কর ফাইল খুলেছে, আশা করব ন্যায় বিচার হবে, দুর্নীতির ফাঁদে পড়ে জীবিকা খোয়ানো শিক্ষক শিক্ষিকারা চাকরি ফিরে পাবেন, প্রায় ৮০০০ বন্ধ স্কুল খুলে যাবে।

গত ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপিত হল। দিনটি প্রতি বছর যেমনভাবে পালন করা হয় এবারেও তা হল—বৃক্ষরোপণ, বিশ্ব উষণয়ন নিয়ে পরিবেশবিজ্ঞানীদের সতর্কীকরণের পুনরাবৃত্তি ইত্যাদি। স্কুল, হাসপাতাল, আবাসন বোমা ও ক্ষেপনাস্ত্রের আঘাতে তছনছ, প্রাণহানির কোনো হিসেব নেই। কিন্তু যুদ্ধ পরিবেশের কতটা ক্ষতি করছে তা নিয়ে কোনো খবর হয় না, হলেও যৎসামান্য। সামরিক বিমানে ঘণ্টা পিছু ২২০০-৩৬০০ লিটার জ্বালানি তেল লাগে, তাই বায়ুদূষণ মাত্রাছাড়া। তা নিয়ে আমরা ততটা ওয়াকিবহাল নই। কার্বন মনোক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, হাইড্রোকার্বন ও সালফার ছাড়াও কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাতাসে মেশে তা ভাবলে আঁতকে উঠতে হয়। আমেরিকা, রাশিয়া, ইরান, ইউক্রেন, ইসরায়েল যুদ্ধে লিপ্ত। তাই তথ্যটি প্রাসঙ্গিক। ওড়িশার আদিবাসী অধ্যুষিত কালাহন্ডি, কোরাপুট জেলায় মূল্যবান খনিজ বক্সাইটের সন্ধান পাওয়া গেছে। তা উত্তোলন করতে পাহাড়ে মাত্রাছাড়া খনন চলবে, গাছপালা

কেটে সাফ করে দেওয়া হবে। সেই সঙ্গে পরিবেশবান্ধব আদিবাসীদের জীবন জীবিকা সুরক্ষিত থাকবে না তা বলাই বাহুল্য। অসম সাহসী আদিবাসীদের প্রতিবাদ এই পরিবেশ ধ্বংস করার বিরুদ্ধে। তাই পরিবেশ দিবসের লেকচার শ্রেফ ফাঁকা আওয়াজ বলে মনে হয়।

দুর্নীতি নিয়ে চারদিক সরগরম। সবটাই রাজনীতির কারবারীদের ভেতরে ঘুরপাক খাচ্ছে। দুর্নীতির একটু অন্যরকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন অধ্যাপক অল্লান দত্ত—আমরা প্রত্যেকেই নানাভাবে সমাজের কাছে ঋণী। আমরা যে অন্ন গ্রহণ করি, বস্ত্র পরিধান করি, নিত্য প্রয়োজনের আরও নানা সামগ্রী ব্যবহার করি, তার কতটুকু নিজে উৎপাদন করি? যে ভাষা, যে সাংস্কৃতিক উপাদান দিয়ে ব্যক্তি তার জীবন গড়ে তোলে, সে সবই বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর কাছ থেকে লব্ধ। এই ঋণ শোধ করবার চেষ্টা অথবা আগ্রহ যার ভিতর নেই সে পরশ্রমজীবী। পরজীবিতাই দুর্নীতি। সমাজের ঋণ কখনও সম্পূর্ণ শোধ হয় না। কিন্তু ঋণশোধের যথাসাধ্য চেষ্টার ভিতরই নীতির পরিচয়। এর অভাবকে বলি দুর্নীতি।

[সমাজ সংস্কৃতি স্মৃতি — অল্লান দত্ত]

উৎস মানুষ ওয়েবসাইট চালানো বেশ কঠিন হয়ে যাওয়ায়, আমাদের ফেসবুকে আর্থিক সহায়তা চেয়ে আবেদন করা হয়। তাতে কয়েকজন শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু সাড়া দেন।

ফলে ওয়েবসাইট চালু রাখা সম্ভব হয়েছে। আমরা সেই বন্ধুদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

— পরিচালকমণ্ডলী।

উ মা

কেরালার গণিত ঘরানা : দ্বন্দ্ব ও বিকাশ

আশীষ লাহিড়ী

কেরালার গণিত ঘরানার বিকাশের একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে। সচরাচর ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বিজ্ঞানের ইতিহাস বলতে আমরা আর্যাবর্তের ইতিহাসকেই বুঝি। কিন্তু আর্যাবর্তের বিজ্ঞান ও গণিতচর্চার অবক্ষয় ও অবসান ঘটান পর কেরালায় যে আশ্চর্য নবজাগরণ ঘটল তার যোগসূত্রটি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অস্পষ্ট। সংস্কৃত ভিত্তিক আর্য ব্রাহ্মণ্যতাত্ত্বিক সংস্কৃতির সঙ্গে দ্রাবিড় কৃষ্টির সংঘাত-সম্মিলন ও সংস্কৃতায়নের দ্বন্দ্বিক প্রক্রিয়ায় মধ্যযুগে কেরালায় এক অসাধারণ সৌধ গড়ে উঠেছিল, যা আজ সারা পৃথিবীতে আদৃত। জর্জ গেভার্গিজ-এর নিরলস প্রচেষ্টায় আমরা তার কিছু পরিচয় পাই।

সাধারণত আমরা ধরে নিই যে একাদশ শতকের পর থেকে “ভারতীয়” বিজ্ঞানচর্চার অধঃপতনের সূত্রপাত। দ্বাদশ শতকে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যর পর আর্যাবর্তে গণিত এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানে আর বিশেষ অগ্রগতি ঘটেনি। শঙ্করাচার্যর মায়াবাদ এবং হিন্দু জাতিভেদ প্রথাকে ন্যায্যতাই এই অধঃপতনের জন্য দায়ী করা হয়। অথচ কেরালায় ওই পর্বের ঠিক পরেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার ধারা। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র, মায়াবাদী দর্শন এবং জাতিভেদ প্রথা তাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। এর ব্যাখ্যা কী? একটা কারণ কি এই হতে পারে যে মায়াবাদ-জাতিভেদের প্রকোপে শুধু পরীক্ষানির্ভর ‘এম্পিরিসিস্ট’ (অভিজ্ঞেয়তাবাদী) বিজ্ঞানের চর্চাই বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল, অপর দিকে গণিতের মতো বহুলাংশে বিমূর্ত চর্চা বরং প্রণোদিতই হয়েছিল? এ বিষয়ে এত কম চর্চা হয়েছে যে কোনো নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসা অনুচিত। কিন্তু প্রশ্নটা ভাবায়।

এখানে আমরা গণিতের কেরালা ঘরানার কয়েকজন দিকপালের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করব।

কেরালার গণিত ঘরানার উদ্ভব ঘটেছিল চোদ্দো শতকের প্রথম কয়েক দশকে। ওই সময়েই এই ঘরানার পত্তনকার সঙ্গমাগ্রম মাধব (আনু. ১৩৪০-১৪২৫)-এর আবির্ভাব। শুরু হল এক গুরু-শিষ্য পরম্পরা, যা চলল দুশো বছরেরও বেশি সময় ধরে।



মাধব

ব্যক্তি মাধব সম্পর্কে অল্পই জানা যায়। তিনি এম্প্রাস্তিরি নামক এক ব্রাহ্মণ পুরোহিত শ্রেণির মানুষ। এঁরা অল্পকাল আগে কর্ণাটকের উপকূল অঞ্চল থেকে এসে কেরালার ব্রাহ্মণ জাতির এক উপবিভাগ হয়ে উঠেছিলেন। মধ্য কেরালার সঙ্গমাগ্রম গ্রামে মাধব-এর জন্ম। ওই গ্রামে প্রভু সঙ্গমাগ্রম-এর একটি মন্দির ছিল, তা থেকেই এই নাম। এ জায়গাটি বর্তমান ত্রিসুর-এর কাছে অবস্থিত, নাম ইরিঞ্জিপল্লী। মাধব-এর বাড়িটিকে আজকের দিনের কাল্লেট্টুংকর রেল স্টেশন থেকে কিলোমিটার আষ্টেক দূরে দুটি নান্মুথিরি গৃহর একটি বলে চিহ্নিত করা গেছে।

১. মাধব-এর যে-কটি রচনা টিকে আছে সেগুলি সবই জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত। সেগুলির উদ্দেশ্য মূলত বররুচির সহজে মনে রাখার উপযোগী ‘বাক্য’ প্রণালীর পরিশীলন। বররুচির এই ‘বাক্য’গুলি রচিত হয়েছিল চতুর্থ শতকে। লক্ষ্য ছিল শুভক্ষরীর আর্থার মতো ছন্দে-গাঁথা ছড়া লিখে গ্রহর অবস্থান ও প্রকৃত দ্রাঘিমা নির্ণয় করার কাজ সহজ করা। ‘ভেনবরোহ’ আর ‘স্মৃতিচন্দ্রপতি’ দুটি বইয়েই মাধব এইসব ‘চন্দ্রবাক্য’-র উন্নতি সাধন করেন। তিনি চাঁদের একেবারে নিখুঁত অবস্থান সেকেন্ডের মাপে গণনা করেন, যা দিবসের ৩৬ মিনিট পর্যন্ত নির্ভুল। এর আগে বররুচির লেখা ‘চন্দ্রবাক্য’গুলো থেকে কেবল মিনিটের হিসেবে নিখুঁতভাবে গণনা করা যেত। চান্দ্র ‘বাক্য’গুলোর চক্রাকার চরিত্র অনুযায়ী ন-টি অসম মাস মিলিয়ে হয় ২৪৮ দিন। সেই চক্র কাজে লাগিয়ে মাধব একটি দিনে সমদূরত্বের ন-টি সময়কালে চাঁদের দ্রাঘিমা নির্ণয় করেন। গ্রহদের দ্রাঘিমা আর লগ্ন গণনা বিষয়েও আলোচনা করেন। তাঁর খ্যাতির মূলে আছে বৃত্ত আর ত্রিকোণমিতিক ফাংশনের অসীম সিরিজ আবিষ্কার। এটি সচরাচর আর্কট্যানজেন্টের গ্রেগরি সিরিজ নামে পরিচিত। আর্কট্যানজেন্ট হল ট্যানজেন্ট ফাংশনের বিপরীত ফাংশন। কোণগুলির ত্রিকোণমিতিক অনুপাত থেকে একটি কোণ নির্ণয়ের জন্য এই পদ্ধতি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত। এছাড়া পাই-এর (π) লাইবনিৎজ সিরিজ এবং সাইন আর কোসাইনের নিউটন পাওয়ার সিরিজ প্রসারণের $1/3600$ ভাগ (আধুনিক মানে) পর্যন্ত নিখুঁত গণনার জন্য তিনি প্রসিদ্ধ। এ বাদেও আছে কতকগুলি চমৎকার আসন্নায়ন।



পরমেশ্বর

২. বটাস্থেরি পরমেশ্বর ছিলেন মাধবের বিশিষ্ট শিষ্য। এক নাস্থুথিরি ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম আলাথিয়ুর-এ, ১৩৬০ সালে। জায়গাটি আজকের দিনের আলাথিয়ুর পালঘাট জেলার দক্ষিণ মালাবারের পোন্নানি তালুকে অবস্থিত। তাঁর ‘গোলদীপিকা’ গ্রন্থে এই গ্রামের উল্লেখ

আছে। তাঁর পিতামাতার খবর খুব বেশি পাওয়া যায় না; কিন্তু পিতামহ ছিলেন এক সুপরিচিত জ্যোতির্বিজ্ঞানী। পরমেশ্বর অনেকগুলি ভাষ্য রচনা করেছিলেন। যথা, আর্থভটর

‘আর্থভটীয়’, ভাস্কর-১-এর ‘মহাভাস্করীয়’ ও ‘লঘুভাস্করীয়’, গোবিন্দস্বামীর ‘মহাভাস্করীয়’র ভাষ্য, মঞ্জুল-এর ‘লঘু মীমাংসা’ এবং ভাস্করাচার্যর ‘লীলাবতী’। ভারতের জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিতের এইসব প্রধান প্রধান রচনা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করে তার বিষয়গুলিকে ছড়িয়ে দেওয়ার মূলে পরমেশ্বরের ভূমিকা অপরিসীম। এরই ফলে পরমেশ্বরের পথ ধরে যাঁরা এলেন তাঁরা হাতের সামনে এই জ্ঞানের সমগ্র ভাণ্ডারটি তৈরি অবস্থায় পেয়ে গেলেন।

দক্ষিণ ভারতে গ্রহ-জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিকাশে পরমেশ্বরের প্রধান অবদান তাঁর *দৃগ্গণিত* প্রণালী। ১৪৩২ সালের রচনায় তিনি এটি ব্যাখ্যা করেছিলেন। এতে তিনি পর্যবেক্ষণের নিরিখে তত্ত্বগুলিকে যাচিয়ে নেওয়ার ওপর গুরুত্ব দেন। নামেই তার প্রমাণ : *দৃগ্গ* অর্থ দেখা আর *গণিত* অর্থ গণিতের তত্ত্বাদি কিংবা গণনা। জ্যোতির্বিজ্ঞানের এই বইটি দুভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে রয়েছে গ্রহকেন্দ্রগুলির গড় অবস্থান আর সমীকরণের গণনা, সেগুলির সংশোধন এবং সাইন থেকে তাদের চাপ গণনার পদ্ধতি। দ্বিতীয় ভাগে প্রথম ভাগের সারসংক্ষেপ পেশ করা হয়েছে। সম্ভবত এই প্রথম ভারতে পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের একটি গাণিতিক মডেল রচিত হল। এ ছাড়াও তিনি লিখেছিলেন ‘গোলদীপিকা’। এতে গোলীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। এর দুটি ভাষ্য আছে। দুটি ভাষ্য মিলে সূর্যঘড়ির ছায়াদৈর্ঘ্য মেপে সময় গণনা, লম্বন, ভূ-সাপেক্ষে জ্যোতিষ্কের চলন নির্দেশক গোলক (আর্মিলারি) নির্মাণ, গ্রহদের প্রকৃত ও আপাত চলন, পৃথিবীর পরিধি মাপার বিবিধ পদ্ধতি এবং আরও অনেক বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছিল।

৩. ১৩৯৩ থেকে ১৪৩২-এর মধ্যে পরমেশ্বর নিকটবর্তী এক সাগর উপকূল থেকে একাদিক্রমে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের ওপর একপ্রস্থ পর্যবেক্ষণ চালিয়ে সেগুলির খতিয়ান লেখেন। এইসব পর্যবেক্ষণের জন্য তিনি সাগর উপকূলের নিম্নজাতির জেলেদের মধ্যে গিয়ে বাস করতে বাধ্য হন। শোনা যায়, এর দরুন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কাছে তিনি একঘরে হয়ে যান। এ কিংবদন্তির সত্যতা যাচাই করা কঠিন। যেটুকু জানা যায় তা হল, তিনি ফলিত জ্যোতিষ বিষয়ে প্রচুর লিখেছিলেন।

(চলবে)

(উৎস: G Geeverghese Joseph, *A Passage to Infinity*, Sage Publication, New Delhi, 2009)

চিকিৎসায় স্পর্শ

সুগত দাশগুপ্ত

চিকিৎসায় “স্পর্শ” শব্দটি উচ্চারণ করলেই সাধারণত আমাদের মনে পড়ে চিকিৎসকের হাতের কথা। স্টেথোস্কোপ বুকে ছোঁয়ানো, নাড়ি দেখা, পেট টিপে পরীক্ষা করা, কিংবা স্নেহময় হাত রেখে রোগীকে আশ্বাস দেওয়া। বহু প্রবীণ চিকিৎসক আজও মনে করেন, চিকিৎসার প্রাণ নিহিত আছে এই শারীরিক স্পর্শের মধ্যেই। কিন্তু আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে ‘স্পর্শ’ শব্দটির অর্থ কি শুধুই ত্বকের সঙ্গে ত্বকের সংযোগে সীমাবদ্ধ? আমার মনে হয়, নয়। বরং চিকিৎসায় স্পর্শের প্রকৃত অর্থ আরও গভীর, আরও জটিল এবং আরও মানবিক।

মানুষ কেবল একটি শরীর নয়। মানুষ একই সঙ্গে স্মৃতি, অনুভূতি, সম্পর্ক, ভয়, আকাঙ্ক্ষা এবং অভিজ্ঞতার সমষ্টি। তাই চিকিৎসা যদি কেবল শরীরের রোগ নিরাময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে মানুষের সম্পূর্ণ সত্তাকে স্পর্শ করা সম্ভব হয় না। চিকিৎসায় স্পর্শ আসলে একটি সংযোগ, এক ধরনের দায়িত্বশীল উপস্থিতি, যেখানে চিকিৎসক রোগীর শরীরের পাশাপাশি তার ভয়, উদ্বেগ, অনিশ্চয়তা এবং বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গেও যুক্ত হয়ে পড়েন। এই সংযোগ কখনও হাতের মাধ্যমে তৈরি হয়, আবার অনেক সময় হাত দিয়ে না ছুঁয়েও তৈরি হয়। আধুনিক চিকিৎসার স্পর্শ মানে কেবল রোগীর গায়ে হাত দিয়ে পরীক্ষা করা নয়; বরং রোগীর সমগ্র চিকিৎসা-পরিক্রমা সম্পর্কে সর্বক্ষণ সচেতন থাকা, তথ্য বিশ্লেষণ করা, বিপদের মুহূর্তে পাশে দাঁড়ানো, এবং রোগী ও তার পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীল ও দায়বদ্ধ থাকা। এসবই স্পর্শের নতুন সংজ্ঞা।

দর্শনের ভাষায় স্পর্শ আসলে অন্যের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেওয়া। একজন মানুষ যখন অনুভব করেন যে তার যত্নগ্ণ আরেকজন মানুষ গুরুত্ব দিয়ে শুনছেন, বুঝতে চাইছেন এবং তার পাশে আছেন, তখনই প্রকৃত সংযোগ তৈরি হয়। একজন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার মুহূর্তে শুধু শারীরিক যত্নগ্ণায় ভোগেন না; তিনি ভোগেন অনিশ্চয়তা, মৃত্যুভয় এবং একাকিত্বও। তার মনে প্রশ্ন জাগে, আমি কি সুস্থ হব? চিকিৎসক কি আমার সমস্যাটি সত্যিই বুঝছেন? আমি কি নিরাপদ? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর সবসময় ওষুধের মধ্যে থাকে না। অনেক সময় চিকিৎসকের উপস্থিতি, মনোযোগ এবং দায়িত্বশীল আচরণই সেই উত্তর হয়ে ওঠে।

একজন ক্যানসারের রোগীকে ধরা যাক। হয়ত চিকিৎসা বিজ্ঞানের সমস্ত উন্নত পদ্ধতি ব্যবহার করেও তার রোগ পুরোপুরি সারানো সম্ভব নয়। কিন্তু চিকিৎসক যদি ধৈর্য ধরে তার সঙ্গে কথা বলেন, তার কষ্টকে অবহেলা না করেন এবং চিকিৎসার প্রতিটি সিদ্ধান্তে তাকে অংশগ্রহণের সুযোগ দেন, তাহলে রোগী মানসিকভাবে অনেক বেশি শক্ত থাকেন। এই শক্তি কোনো ওষুধের নয়; এটি মানবিক সংযোগের শক্তি। এই সংযোগই চিকিৎসায় স্পর্শের মনস্তাত্ত্বিক রূপ।

দুঃখের বিষয়, চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই সংযোগ অনেক সময় সঠিকভাবে গড়ে ওঠে না। সরকারি হাসপাতালের ভিড়, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্পোরেট চাপ, সীমিত সময় এবং প্রযুক্তিনির্ভর চিকিৎসা, সব মিলিয়ে রোগী ও চিকিৎসকের সম্পর্ক প্রায়শই যান্ত্রিক হয়ে পড়ে। রোগী অনেক সময় মনে করেন তিনি যেন একটি “কেস নম্বর” মাত্র। অন্যদিকে চিকিৎসকরাও ক্রমাগত চাপ, ক্লান্তি এবং প্রশাসনিক জটিলতার মধ্যে মানবিক সংযোগ বজায় রাখতে ব্যর্থ হন। ফলে চিকিৎসার বৈজ্ঞানিক দিক এগোলেও মানসিক দূরত্ব বেড়ে যায়।

এই প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার কথা বলা জরুরি। যেখানে চিকিৎসা বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে দেওয়া হয়, সেখানে অনেক সময় চিকিৎসাকে ‘দয়া’ বা ‘করুণা’ হিসেবে দেখার এক প্রচ্ছন্ন প্রবণতা তৈরি হয়। কিছু প্রশাসক, রাজনীতিবিদ, এমনকি কিছু স্বাস্থ্যকর্মীর মধ্যেও এই মনোভাব দেখা যায় যে তাঁরা যেন জনগণের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করছেন। কিন্তু চিকিৎসা কখনোই দয়া নয়। চিকিৎসা একটি অধিকার, এবং চিকিৎসক একজন প্রশিক্ষিত পেশাজীবী মাত্র। যখন চিকিৎসাকে করুণা হিসেবে দেখা হয়, তখন রোগী ও চিকিৎসকের মধ্যে সমতার সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। রোগী তখন নিজেকে অধস্তন ভাবতে শুরু করেন, আর চিকিৎসা হয়ে ওঠে ক্ষমতার প্রদর্শন। এই মনোভাব চিকিৎসায় স্পর্শের ধারণার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কারণ প্রকৃত স্পর্শের মধ্যে থাকে সম্মান, দায়িত্ব এবং পারস্পরিক মানবিকতা। দয়া দেখানো যায় দূর থেকে; কিন্তু স্পর্শ তৈরি হয় সংযোগের মাধ্যমে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদি উন্নতির জন্য এই মানসিকতার পরিবর্তন অত্যন্ত জরুরি।

অপরদিকে বেসরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার সমস্যা সম্পূর্ণ ভিন্ন। নব্য উদার অর্থনীতির যুগে বেসরকারি চিকিৎসা একটি বৃহৎ ব্যবসায়িক শিল্পে পরিণত হয়েছে। এখানে উন্নত প্রযুক্তি, আধুনিক পরিকাঠামো, বীমা কোম্পানির জটিলতা এবং কর্পোরেট ব্যবস্থাপনার মধ্যে অনেক সময় রোগী এক “গ্রাহক”-এ পরিণত হন। হাসপাতালের আয়-ব্যয়, মুনাফা, প্যাকেজ, এসবের ভিড়ে চিকিৎসার মানবিক দিক চাপা পড়ে যায়।

একথা ঠিক যে চিকিৎসা একটি ব্যয়বহুল পরিষেবা, এবং ব্যবসায়িক শিল্পে মুনাফাকে অস্বীকার করা একদমই বাস্তবসম্মত নয়। কিন্তু স্বাস্থ্যব্যবস্থায় যদি শুধুই পুঁজির দম্ভ ও ভাষা প্রাধান্য পায়, তাহলে চিকিৎসায় স্পর্শ হারিয়ে যেতে বাধ্য। কারণ মানুষের শরীর কোনো যন্ত্র নয়; এটি একটি প্রবাহমান, জটিল এবং মানবিক বাস্তবতা। একজন রোগী হাসপাতাল থেকে ছুটি পাওয়ার পরেও তার উদ্বেগ, প্রশ্ন এবং শারীরিক সমস্যাগুলো শেষ হয়ে যায় না। কিন্তু কর্পোরেট কাঠামো অনেক সময়ই সেই দীর্ঘমেয়াদি সংযোগের দায় নেয় না। এখানেই স্পর্শের গুরুত্ব আবার সামনে আসে।

স্পর্শ মানে শুধু শয্যার পাশে দাঁড়ানো নয়; বরং রোগীর চিকিৎসা-পরবর্তী জীবন সম্পর্কেও কিছুটা সচেতন থাকা। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরেও রোগীর সঙ্গে ন্যূনতম সংযোগ বজায় রাখা, তার সমস্যা সম্পর্কে অবহিত থাকা এবং প্রয়োজনে পরামর্শ দেওয়া, এসবই আধুনিক চিকিৎসার মানবিক দিককে শক্তিশালী করে। অনেক ক্ষেত্রেই বেসরকারি হাসপাতালের অচিকিৎসক কর্পোরেট কর্মীরা অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নেন, যাদের কাছে রোগীর সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক রক্ষার দায়বদ্ধতা থাকে না। অথচ মানুষের শরীরকে সামগ্রিকভাবে বোঝার জন্য এই ধারাবাহিক সংযোগ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

চিকিৎসকদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। আমরা অনেক সময় মনে করি, রোগী হাসপাতাল ছেড়ে চলে গেলে বা আউটডোর থেকে প্রেসক্রিপশন নিয়ে বেরিয়ে গেলে আমাদের দায়িত্ব শেষ। কিন্তু প্রকৃত চিকিৎসা কি সত্যিই এত সীমিত? আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হল রোগীর দীর্ঘমেয়াদি তথ্য, ইতিহাস এবং শারীরিক পরিবর্তনের ধারাবাহিক বিশ্লেষণ। এই কারণে প্রযুক্তিনির্ভর ইলেকট্রনিক স্বাস্থ্য-রেকর্ড আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের মতো বহুল জনসংখ্যার দেশে সমস্ত সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ব্যাপকভাবে এই প্রযুক্তিনির্ভর

ইলেকট্রনিক হেলথ রেকর্ড সিস্টেম চালু করা আশু প্রয়োজন।

অনেকে মনে করেন, প্রযুক্তি চিকিৎসাকে অমানবিক করে তুলছে। কিন্তু এই ধারণার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ সহমত নই। ব্যবহার করতে পারলে প্রযুক্তি চিকিৎসায় স্পর্শকে আরও শক্তিশালী করতে পারে। কারণ প্রযুক্তির সাহায্যে রোগীর পূর্ববর্তী রোগ, পরীক্ষার ফল, ওষুধের প্রতিক্রিয়া এবং শারীরিক পরিবর্তন দ্রুত জানা যায়। এতে চিকিৎসক রোগীকে আরও সামগ্রিকভাবে বুঝতে পারেন। এই ধারাবাহিক সচেতনতাই এক ধরনের আধুনিক স্পর্শ। বহু প্রবীণ চিকিৎসক অভিযোগ করেন যে নবীন চিকিৎসকেরা আজকাল রোগীর গায়ে হাত দিয়ে দীর্ঘক্ষণ পরীক্ষা করেন না। ক্রিটিকাল কেয়ার মেডিসিনের মতো একটি সংকটজনক এবং জটিল বিষয়ের শিক্ষক চিকিৎসক হিসেবে আমি এই অভিযোগ পুরোপুরি মানতে পারি না। সময় বদলেছে। রোগীর সংখ্যা বেড়েছে। প্রযুক্তির উন্নতির ফলে আজ বহু তথ্য সহজে পাওয়া যায়, যা আগে কেবল শারীরিক পরীক্ষার মাধ্যমে অনুমান করতে হত। কয়েক দশক আগে একজন চিকিৎসক হয়ত রোগীর বুক শুনে বা পেট টিপে যে তথ্য সংগ্রহ করতেন, আজ সেই তথ্য আল্ট্রাসাউন্ড, সিটি স্ক্যান, অন্যান্য আধুনিক ইমেজিং বা ল্যাবরেটরি নির্ভর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে অনেক নির্ভুলভাবে জানা সম্ভব। তাহলে প্রযুক্তিকে ব্যবহার না করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কিন্তু সমস্যা তখনই তৈরি হয়, যখন প্রযুক্তিকে মানবিক বিশ্লেষণের বিকল্প মনে করা হয়।

প্রযুক্তি নিজে কখনো চিকিৎসা করে না। প্রযুক্তি কেবল তথ্য দেয়। সেই তথ্য বুঝতে হয়, বিশ্লেষণ করতে হয়, এবং রোগীর সামগ্রিক অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হয়। এই বিশ্লেষণের জন্য যে সময়, শ্রম এবং অধ্যবসায় প্রয়োজন, সেটিও এক ধরনের স্পর্শ। কারণ আধুনিক চিকিৎসকের দায়িত্ব শুধু শরীরে হাত দেওয়া নয়; বরং রোগীর শারীরিক অবস্থার প্রতিটি জটিল তথ্যের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্নভাবে যুক্ত থাকা। এই কাজ সহজ নয়। এর জন্য ক্রমাগত পড়াশোনা, আপ-টু-ডেট থাকা এবং বৌদ্ধিক শ্রমের প্রয়োজন। এই জায়গায় ঘাটতি তৈরি হলেই রোগী অনুভব করেন যে চিকিৎসায় কোথাও যেন সংযোগের অভাব রয়েছে। তখন চিকিৎসক-রোগী সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়ে।

চিকিৎসায় স্পর্শের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল ‘উপস্থিতি’। বিশেষত ক্রিটিকাল কেয়ার ইউনিটের মতো জটিল পরিবেশে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন রোগী যখন সংকটজনক অবস্থায় থাকেন, তখন চিকিৎসক সবসময়

রোগীর শরীরে হাত দিয়ে কাজ করেন না। কিন্তু তাঁর উপস্থিতি, নেতৃত্ব এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতনতা পুরো চিকিৎসা পরিক্রমাকে প্রভাবিত করে। একজন দক্ষ চিকিৎসক সংকটের মুহূর্তে শারীরিকভাবে উপস্থিত থেকে নার্স এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের পরিচালনা করেন, দ্রুত সিদ্ধান্ত নেন, এবং সবার মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি করেন। এই উপস্থিতিও এক ধরনের স্পর্শ। কারণ সেই উপস্থিতি রোগীর জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। অনেক সময় স্পর্শের সবচেয়ে গভীর প্রকাশ ঘটে নীরবতার মধ্যেও। সারারাত মনিটরের ওঠানামা লক্ষ্য করা একজন রেসিডেন্ট চিকিৎসক কিংবা ভোররাতে পরিবারের সদস্যদের ফোন করে রোগীর অবস্থার খোঁজ দেওয়া একজন সিনিয়র চিকিৎসক, এঁরা প্রত্যেকেই রোগীকে এক ধরনের মানবিক স্পর্শ দিচ্ছেন।

ক্রিটিকাল কেয়ার ইউনিটে ভর্তি থাকা রোগীর পরিবারের দৃষ্টিকোণ থেকেও পর্যালোচনা জরুরি। সংক্রমণের ঝুঁকি বা অন্যান্য কারণে তাঁরা অনেক সময় রোগীর কাছে যেতে পারেন না, প্রিয়জনকে স্পর্শ করতে পারেন না। কিন্তু তাই বলে কি তাঁদের জানার অধিকার শেষ হয়ে যায়? নিশ্চয়ই নয়। বরং এই সময়েই চিকিৎসকের দায়িত্ব আরও বেড়ে যায়। রোগীর পরিবারের সঙ্গে সময় নিয়ে কথা বলা, রোগের জটিলতা বোঝানো, চিকিৎসার প্রতিটি ধাপ ব্যাখ্যা করা এবং তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, এসবই চিকিৎসায় স্পর্শের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অনেক সময় চিকিৎসকরা এই যোগাযোগকে বাড়তি কাজ মনে করেন। সত্যিই, অনেক অযাচিত প্রশ্ন আসে, কখনও অভিযোগও ওঠে। তবুও পেশাগত নিরাপত্তা বজায় রেখে মানবিক সংযোগ ধরে রাখার কৌশল চিকিৎসকদের শিখতেই হবে। কারণ সংযোগ ছিন্ন হয়ে গেলে চিকিৎসার ওপর বিশ্বাসও নষ্ট হয়।

ডিমেনশিয়ার রোগীদের ক্ষেত্রে স্পর্শের এই মনস্তাত্ত্বিক এবং মানবিক দিকটি আরও গভীরভাবে বোঝা যায়। ডিমেনশিয়া ধীরে ধীরে মানুষের স্মৃতি ও চিন্তাশক্তিকে ক্ষয় করে দেয়। অনেক সময় রোগী নিজের সন্তানের নাম ভুলে যান, এমনকি সময়-স্থান সম্পর্কেও বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এই স্মৃতির বিদ্রোহের মধ্যেও তাঁরা অনেক সময়েই প্রিয়জনের উপস্থিতি অনুভব করতে পারেন। একজন বৃদ্ধা ডিমেনশিয়া রোগীর কথা ভাবা যাক। তিনি হয়ত অসংলগ্ন কথা বলছেন, চারপাশের মানুষদের চিনতে পারছেন না, বারবার অস্থির হয়ে উঠছেন। কিন্তু তাঁর ছেলে যখন প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে এসে চুপচাপ তাঁর ঘরে বসেন, তাঁর হাত ধরে

থাকেন, আপাত অপ্রাসঙ্গিক বিষয়েও কথা বলে চলে, তখন রোগীর অস্থিরতা কমে যায়। অনেক সময় তাঁর মুখে স্বস্তির অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে। এখানে শুধুমাত্র প্রিয়জনের নিকট উপস্থিতিই নিরাময়মুখী স্পর্শের নামান্তর। মানুষের মস্তিষ্কে সম্পর্কের স্মৃতি অনেক সময় ভাষা বা যুক্তির স্মৃতির থেকেও দীর্ঘস্থায়ী হয়। তাই ডিমেনশিয়া রোগী হয়ত শব্দ ভুলে যান, কিন্তু পরিচিত মানুষের উপস্থিতির নিরাপত্তাবোধ ভুলে যান না। সেই কারণেই দীর্ঘমেয়াদি পরিচর্যার ক্ষেত্রে আজ বিশ্বজুড়ে “উপস্থিতি নির্ভর পরিচর্যা” গুরুত্ব বাড়ছে।

একইভাবে শিশুদের ক্ষেত্রেও স্পর্শের মনস্তাত্ত্বিক গুরুত্ব অত্যন্ত গভীর। হাসপাতালে ভর্তি শিশু যখন অপারেশনের আগে আতঙ্কে কাঁদে, তখন অনেক সময় মায়ের কোলে মাথা রাখলেই সে শান্ত হয়ে যায়। এখানে চিকিৎসার বৈজ্ঞানিক অংশ অপরিবর্তিত থাকলেও মানসিক নিরাপত্তা রোগ নিরাময়ের প্রক্রিয়াকে সহজ করে তোলে।

মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ এক সংযোগ-পিপাসু জীব। জন্মের পর থেকেই মানুষ নিরাপদ সংযোগ খোঁজে। চিকিৎসক-রোগী সম্পর্কেও সেই প্রবণতা কাজ করে। রোগী এমন একজনকে খোঁজেন, যিনি শুধু প্রেসক্রিপশন দেবেন না, বরং তার অসহায় অবস্থাকে বুঝবেন। একজন চিকিৎসক যখন রোগীর দিকে তাকিয়ে বলেন, ‘আমি আছি, আমরা চেষ্টা করছি’, তখন সেই বাক্যের মধ্যে এক ধরনের গভীর মনস্তাত্ত্বিক স্পর্শ থাকে। আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর চিকিৎসায় এই মানবিক দিকটি অনেক সময় আড়ালে চলে যায়। মনিটর, রিপোর্ট, অ্যালগরিদম, সব কিছুই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এর মাঝেও রোগী যেন অনুভব করেন যে তিনি কেবল একটি ‘ডেটা সেট’ নন। কারণ প্রযুক্তি তথ্য দিতে পারে, কিন্তু নিরাপত্তাবোধ দেয় মানুষ।

সবশেষে বলা যায়, চিকিৎসায় স্পর্শের ধারণাকে নিয়ে আজ নতুনভাবে ভাবার সময় এসেছে। স্পর্শ মানে শুধু রোগীর শরীরে হাত রাখা নয়। স্পর্শ মানে দায়িত্বশীল সংযোগ, উপস্থিতি, সচেতনতা, দায়বদ্ধতা এবং মানবিকতা। একজন চিকিৎসক যখন রোগীর সমস্ত তথ্য বিশ্লেষণ করেন, রাত জেগে মনিটরের দিকে তাকিয়ে থাকেন, সংকটের মুহূর্তে নেতৃত্ব দেন, কিংবা পরিবারের মানুষদের ধৈর্য ধরে বোঝান, তখনও কিন্তু তিনি প্রকৃতপক্ষে রোগীকে এক ধরনের গভীর স্পর্শ দিচ্ছেন। চিকিৎসার সবচেয়ে বড় শক্তি বিজ্ঞান এবং মানবিকতার এই মিলনেই নিহিত। শুধুমাত্র আবেগ দিয়ে চিকিৎসা হয় না, আবার শুধুমাত্র প্রযুক্তি দিয়েও মানুষকে

সুস্থ করা যায় না। এই দুইয়ের মাঝখানে যে দায়িত্বশীল সংযোগ তৈরি হয়, সেটিই আধুনিক চিকিৎসায় স্পর্শের প্রকৃত অর্থ। অতএব, চিকিৎসায় স্পর্শকে যদি আমরা কেবল শারীরিক পরীক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখি, তাহলে তার গভীরতম মানবিক, দার্শনিক এবং মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্যকে অস্বীকার করা হবে। স্পর্শ মানে উপস্থিতি থাকা, সংযুক্ত থাকা, সচেতন থাকা, দায়বদ্ধ থাকা এবং অন্যের যন্ত্রণাকে গুরুত্ব দেওয়া। একজন চিকিৎসক, একজন নার্স, একজন স্বাস্থ্যকর্মী অথবা একজন প্রিয়জন, যে কেউ এই স্পর্শের বাহক হতে পারেন। কারণ শেষ পর্যন্ত মানুষ কেবল ওষুধে বাঁচে না; মানুষ বাঁচে সম্পর্ক, বিশ্বাস এবং উপস্থিতির মধ্য দিয়েও।

উমা

যন্ত্রমেধার পাহারাদার সোনাবুরি মৈত্র

আমাদের প্রতিদিনের তথ্যপ্রযুক্তির যে বিরাট আকারে ব্যবহার, তার থেকে উৎপত্তি হয় অসংখ্য ডেটার। বর্তমান যুগে প্রাণের পরেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এখন ডেটা। সেই ডেটা যদি ভুলবশত অপব্যবহারকারীর হাতে পড়ে যায়, তার থেকে কিন্তু হয়ে যেতে পারে খুব গুরুতর ক্ষতি। তথ্যপ্রযুক্তির তো কোনো সিআরপিএফ নেই, কোনো বিএসএফও নেই। তাহলে এই ডেটা সংরক্ষণ করে কে?

আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই এমন একজনের সাথে, যে আমাদের প্রত্যেকের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গী। আমাদের সবার কাছেই আছে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তার ব্যাপারে জানেই না—ওই ‘আনসাং হিরো’ ধরনের ব্যাপার আর কি। যার কথা বলছি, তার একটা পোশাকি নাম আছে—ফায়ারওয়াল। বাংলা ভাষায় কাব্য করে তাকে অগ্নিজাল ইত্যাদি বলা যেতেই পারে, কিন্তু তার কাজটা তার ইংরেজি নামের মতোই সোজাসাপ্টা, অর্থাৎ যে দেওয়াল আগুনকে ছড়ানো থেকে আটকায়। ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ভাষায় এই আগুন হল সাইবার অ্যাটাক। এই মেকি দেওয়ালটি বাইরের থেকে হওয়া আক্রমণকে রুখতে পারে।

কী করে রুখতে পারে, সেটা একটু বোঝার চেষ্টা করে দেখা যাক। ধরুন আপনার বাড়িতে মোবাইল, ল্যাপটপ, ট্যাব মিলিয়ে খান পাঁচেক যন্ত্র আছে। আমরা প্রত্যেকেই যারা অন্তর্জাল ব্যবহার করি, তাদের বাড়িতে একটি বস্তু থাকে, যাকে আমরা চলতি ভাষায় ওয়াইফাই বলে চিনি, একটা ছোট চৌকো মতো বাক্স, তার আসল নাম কিন্তু রাউটার। এবার পরবর্তী প্রশ্ন আসে, অন্তর্জাল ব্যবহারের জন্য যদি রাউটারের প্রয়োজন হয়, তাহলে আমরা যখন মোবাইল ফোন হাতে বাইরে যাই, তখন ইন্টারনেট পাই কী করে? তার সহজ উত্তর

মোবাইল টাওয়ার। সেগুলোও কিন্তু এক ধরনের রাউটার হিসেবেই কাজ করে।

এবার আমরা আবার বাড়ির চার দেওয়ালের মধ্যে ফিরে আসি। ধরুন আপনার বাড়িটা প্রকাণ্ড এক দুর্গ। বাইরে থেকে কেউ ঢুকতে চাইলে প্রথমে তাকে মূল ফটক পেরোতে হবে। এই ফটকটাই হল রাউটার। আপনার মোবাইল, ল্যাপটপ, টিভি—সবকিছু এই ফটকের ভেতরে থাকে। বাইরে থেকে কেউ কড়া নাড়লেই এই দুর্গে ঢুকতে পারবে না। তাকে প্রমাণ করতে হবে যে সে সত্যিই অনুপ্রবেশকারী নয়।

আপনি যখন কোনো ওয়েবসাইট খুলছেন, তখন আপনার ডিভাইস আগে রাউটারকে বলবে—‘আমাকে এই ঠিকানায় নিয়ে চল।’ রাউটার সেই অনুরোধটাকে বাইরে পাঠায়। আবার যখন তথ্য ফিরে আসে, রাউটার দেখে এই তথ্যটা কি সত্যিই সেই অনুরোধের জবাব, নাকি অন্য কোথাও থেকে আসা একটি সন্দেহজনক বার্তা; সেটা যাচাই করে তবেই আপনার মোবাইল বা ল্যাপটপে তাকে ঢুকতে দেয়। তবে রাউটারের কাজটা কিন্তু মোটেই এতটা সোজা নয়, তার ভেতরে আরও অনেক রকম কারসাজি আছে, যেটা আমাদের ডেটাকে সুরক্ষিত রাখতে সাহায্য করে।

প্রথমেই আসি একটা মজার ব্যাপারে NAT বা Network Address ট্রান্সলেশন। নামটা শুনতে কঠিন লাগলেও ব্যাপারটা একদম সহজ। ধরুন, একটা বড় বাড়িতে পাঁচজন থাকে। কিন্তু বাইরে চিঠি পাঠানোর সময় তারা সবাই একই ঠিকানা ব্যবহার করে। ফলে বাইরে থেকে কেউ বুঝতেই পারে না ভেতরে আসলে কতজন মানুষ আছে রাউটারের কাজও অনেকটা তাই।

বাড়ির ভেতরে মোবাইল, ল্যাপটপ, স্মার্ট

টিভি—প্রত্যেকটা ডিভাইসের আলাদা আলাদা ঠিকানা থাকে। কিন্তু যখন তারা ইন্টারনেটে যায়, রাউটার তাদের হয়ে একটাই বাইরের পরিচয় ব্যবহার করে। এতে লাভ কী? বাইরে থাকা কেউ সহজে আপনার নির্দিষ্ট ডিভাইসটিকে চিহ্নিত করতে পারে না। কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকেই যায়, এই NAT জিনিসটার আদতে দরকারটা কী? শুধু লুকোচুরি খেলবার জন্যেই কি এই ব্যবস্থা?

NAT ব্যবহারের প্রধান দুটি কারণ আছে। প্রথম কারণ: নিরাপত্তা। ধরুন, আপনার বাড়ির প্রতিটা ঘরের দরজা যদি সরাসরি রাস্তার দিকে খুলে যেত, তাহলে কী হত? বাইরে থেকে যে কেউ সরাসরি যে কোনো ঘরে ঢুকে পড়তে পারত। ঠিক তেমনই, যদি আপনার প্রতিটা ডিভাইস সরাসরি ইন্টারনেটের সামনে উন্মুক্ত থাকে, তাহলে হ্যাকার, অর্থাৎ ইন্টারনেটের দুষ্ট লোকদের কাজ অনেক সহজ হয়ে যেত। NAT সেই সরাসরি যোগাযোগটাই ভেঙে দেয়।

বাইরের দুনিয়া আপনার একটাই পরিচয় দেখে—রাউটার। ভেতরের আলাদা আলাদা ডিভাইসগুলো আড়ালেই থেকে যায়। ফলে আক্রমণ করতে গেলে আগে সেই মুখোশ ভাঙতে হবে, যা সহজ কাজ নয়।

দ্বিতীয় কারণ : অভাব। ইন্টারনেটের প্রতিটি ডিভাইসের জন্য একটি করে ঠিকানা লাগে, যাকে বলে IP address। কিন্তু এই ঠিকানার সংখ্যা সীমিত, বিশেষ করে পুরনো IPv4 ব্যবস্থায়। এখন যদি বাড়ির প্রতিটি মোবাইল, ল্যাপটপ, টিভি প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা ঠিকানা লাগে, তাহলে খুব তাড়াতাড়ি এই ঠিকানা ফুরিয়ে যাবে। তাই একটা মাত্র ঠিকানা ব্যবহার করে ভেতরের অনেকগুলো ডিভাইসকে একসাথে চালিয়ে নেওয়াটাও NAT-এর প্রধান কার্যকারিতা।

এই রাউটারের মধ্যেই কিন্তু থাকে আমাদের ফায়ারওয়াল। ফায়ারওয়াল কীভাবে কাজ করে, সেটা বোঝার জন্য আমাদের আরেকটা ছোট জিনিস বুঝতে হবে — প্যাকেট ফিল্টারিং। ইন্টারনেটে আসা-যাওয়া করা প্রতিটা তথ্য ছোট ছোট ‘প্যাকেট’ হিসেবে যাতায়াত করে। প্রতিটা প্যাকেটের গায়ে লেখা থাকে সে কোথা থেকে আসছে, কোথায় যাচ্ছে। রাউটার এই লেখাটি পড়ে। যদি তার মনে হয় একটি প্যাকেট কোনো সন্দেহজনক জায়গা থেকে এসেছে, বা এমন কোনো দরজায় ঢুকতে চাইছে যেটা খোলা থাকার কথা নয়, তখন সে সেই প্যাকেটকে সোজা ফেরত পাঠিয়ে দেয়। মানে, সব চিঠি ঘরে ঢোকে না, দরজার সামনে দাঁড়িয়েও অনেকগুলোই বাতিল

৮

হয়ে যায়। এবার আমরা আসি ফায়ারওয়ালে।

ফায়ারওয়াল চলে কিছু নিয়মাবলীর ওপর, যাকে বলা হয়, ফায়ারওয়াল রুলস, অনেকটা দারোয়ানের হাতে একটি নিয়মের খাতার মতো। ধরুন, খাতায় লেখা আছে যে, রাত ২টোর পর কোনো নতুন অতিথি ঢুকতে পারবে না, অথবা কোনো এক বিশেষ গলি দিয়ে কেউ ঢুকতে পারবে না। দারোয়ান সেই নিয়ম মেনে এই যাওয়া-আসার পথগুলোয় কড়া নজরদারি করবে। ঠিক তেমনভাবেই ফায়ারওয়ালও ঠিক করে দেয় কোন ধরনের ট্রাফিক ঢুকবে, আর কোনটা ঢুকবে না। অনেক সময় কিছু নির্দিষ্ট পথ, যাকে পোশাকি ভাষায় পোর্ট বলা হয়, তা পুরোপুরি বন্ধ রাখা হয়, কারণ সেগুলো দিয়ে হামলার সম্ভাবনা বেশি।

ফায়ারওয়াল না হয় দরজা সামলায় আর রাউটার পথ দেখায়। কিন্তু তারপরেও তো কেউ চুপিসারে ঢুকে পড়তে পারে। আর ঢুকে পড়লেই কেবলা ফতে— আমাদের সব ডেটা তাদের হাতের মুঠোয়। তাহলে উপায় কী? এখানেই আসে সুরক্ষার আরেকটি নতুন স্তর—এনক্রিপশন।

এনক্রিপশন মানে বার্তাকে এমনভাবে বদলে দেওয়া, যাতে সেটা দেখলে মনে হয় একেবারে আজগুবি কিছু। অর্থাৎ অন্তর্জালে আপনার নিজের ডেটাকে দেখলে আপনি নিজেই চিনতে পারবেন না, সে ভোল পাল্টে তখন একেবারে অন্য মানুষ। ব্যাপারটা অনেকটা শার্লক হোমসের ‘দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য ড্যান্সিং মেন’ গল্পের মতো। কিছু অদ্ভুত নাচতে থাকা মানুষের মতো চিহ্ন দিয়ে বার্তা পাঠানো হচ্ছে। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে কেউ বোধহয় ফাঁকা সময়ে আঁকিবুঁকি করেছে, কিন্তু আসলে সেগুলো হল গোপন বার্তা। একেকটা চিহ্ন মানে একেকটা অক্ষর। তবে আধুনিক এনক্রিপশন শার্লক হোমসের গল্পের থেকে অনেক বেশি শক্ত, এবং তাদের সমাধান করাটা প্রায় অসম্ভব। ডেটা নিয়ে তাকে আজগুবি রূপ দেওয়াটা কিন্তু তথ্যপ্রযুক্তির একটি সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ জায়গা, যার নাম ক্রিপ্টোগ্রাফি।

তবে দেওয়াল, গোপন ভাষা—সব মিলিয়ে একটি অজেয় দুর্গ তৈরি করলেও, দুর্গের ভেতরে যারা থাকে তারা কতটা সচেতন, তাই নিয়ে একটি প্রশ্ন বারবার উঠে আসে। দারোয়ান সব নিয়ম মেনে চলছে, দরজা শক্ত করে বন্ধ করা। কিন্তু ভেতরের কেউ যদি নিজেই দরজাটা খুলে দেয়, অথবা কাউকে বিশ্বাস করে নিজের চাবিটাই তার হাতে তুলে দেয়, তখন কিন্তু দুর্গ ভেঙে পড়বেই।

এখানেই আসে
সবচেয়ে অস্বস্তিকর
সত্যটা।

সাইবার নিরাপত্তার
জগতে সবচেয়ে দুর্বল
জায়গাটা কোনো যন্ত্র নয়,
সেটা মানুষ। ফিশিং মেল,
ভুয়ো লিঙ্ক, অ্যাকাউন্ট বন্ধ
করে দেওয়ার হুমকি,
এসবের ফাঁদে পা দিয়ে
আমরা নিজেরাই অনেক
সময় সেই দরজা খুলে দিই।
যন্ত্রমেধার এই পাহারাদাররা
আমাদের জন্য লড়াই করে
ঠিকই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুর্গ
রক্ষা করার দায়িত্বটা
আমাদের হাতেই। দরজা
বাইরে থেকে খোলা যেমন
শক্ত, ভেতর থেকে
খোলাটা কিন্তু ততটাই
সহজ।

আমাদের এই ডিজিটাল
জীবনটা অনেকটা এক
অদৃশ্য যুদ্ধক্ষেত্রের মতো।
একদিকে নিঃশব্দ প্রহরীরা
যন্ত্রমেধার পাহারাদাররা,
অন্যদিকে অদৃশ্য
অনুপ্রবেশকারীরা, যারা
সুযোগের অপেক্ষায়। আর
মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমরা
নিজেদের অজান্তেই
কখনো সৈনিক, কখনো
দুর্বলতা। অদৃশ্য এই যুদ্ধে
সবচেয়ে বড় অস্ত্র প্রযুক্তি
নয়, সচেতনতা। আর
সবচেয়ে বড় ফাঁক কোনো
সফটওয়্যারের ত্রুটি নয়,
মানুষের অসাবধানতা। **উমা**

চলো বদলাই : বড়ো সময়ে ছোটো লেখা

শুভেন্দু দাশগুপ্ত

উৎস মানুষ পত্রিকায় এর আগে পরপর দুটো বা তিনটি লেখায় লিখেছিলাম— বড়োদের
সহায়তায় ছোটোরা কি কি করতে পারে। কোনো সাড়া পাইনি। খুব একটা পাবো না
ভেবেইছিলাম। তবে একেবারেই পাবো না ভাবিনি।

এখন মনে হয় যদি বাড়ির বড়োদের জন্য লিখতাম তা হলেও পেতাম না। ছোটোদের জন্য
লেখা ছোটোরা হয়তো পড়ে নি। বড়োরা পড়লে হয়তো ছোটোদের বলতো। হয়তো একটা
দুটো কাজ হতো। ধরে নিলাম বড়োরা হয়তো পড়েছে। পড়লেও ছোটোদের বলেনি। কারোর
দোষ নয়।

যখন উৎস মানুষ বের করা শুরু হয়, সেই সময়টা আর এখন এই সময়টার মধ্যে বিশাল
ফারাক। কিসের ফারাক?

এক একজন এক একভাবে ফারাকটা বুঝবে। আমি যে ভাবে বুঝেছি লিখি। সবাই একমত
হবে না জেনে নিয়েই। তবে এই লেখাটা পড়ে মত এলে খুব আনন্দ হবে।

আজকাল এই এক অসুবিধা—যাঁরা লেখাটা পড়লেন তাঁরা তাঁদের মতামত জানান না।
বুঝতে পারি না ঠিক লিখলাম না ভুল লিখলাম। আমার অনুরোধ এই লেখাটা পড়ে জানান
আপনাদের মতামত। আমার খুব উপকার হবে। হয়তো অন্য পাঠিকা পাঠকদেরও হবে।

লেখক একা লেখে না, পাঠিকা পাঠক না থাকলে লেখা হয় না।

আমরা যখন উৎস মানুষ এবং এই ধরনের পত্রিকা বের করা শুরু করি তখন মনে করেছিলাম
কয়েকটা বিষয় আমাদের কাছে যে ভাবে আসে, আনা হয়, তা সঠিক নয়। আনতো সরকার,
সরকারে থাকা দল, সরকারে যেতে চাওয়া দল, পুঁজি বাজার, বিজ্ঞাপন, আর তার বিপরীতে
আমরা।

বিষয়গুলো এই বড়ো বয়সে যতটা মনে পড়ছে বলার চেষ্টা করছি। কুসংস্কার ধর্ম, নারী-পুরুষ
সম্পর্ক, অবিজ্ঞান, আচার, অনুষ্ঠান, বিজ্ঞান স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, লেখাপড়া, লোকবিজ্ঞান, লোকাচার,
প্রকৃতি এমন সব। বাকি সব আপনাদের মনে থাকা অনুযায়ী যোগ করুন।

আমরা জানতে শুরু করলাম। যারা জানে তাদের কাছে যাওয়া শুরু করলাম। সভা করলাম,
মিছিল করলাম, ইস্তেহার ও ছোটো ছোটো বই লিখে বিলি করলাম, তক্কো করলাম। কুসংস্কার
নিয়ে মাঠে সভা করে হাতেনাতে দেখিয়ে দিলাম। কেন সেটা বুজরুকি, অবিজ্ঞান, কুসংস্কার।
পোস্টার এঁকে সুতলি দড়িতে লাগিয়ে পাড়ায় পাড়ায় বুলিয়ে দিলাম। পত্রিকা হাতে হাতে
বিক্রি করতাম। যেখানেই ডাক পেয়েছি, সুযোগ পেয়েছি গণবিজ্ঞান নিয়ে বলেছি— এই সব
ছিল আমাদের সবার কাজ।

মোবাইলে লেখা/কথা পাঠিয়ে নয়। দেখা করে, কথা বলে, চা বিস্কুট খেয়ে কাজ ভাবা,
কাজ ঠিক করা। অন্যদের চোখমুখ চকচক করলেই নিজের মুখও চকচক করেছে। বুকে জোর
এসেছে। মুখে কথা এসেছে। মাথায় কাজ এসেছে।

চলো ফিরে যাই সেই সময়ে।

অতীতচারিতা যার চলতি নাম ‘নস্টালজিয়া’ তা নয়। আমার কাছের মানুষ মোহিত রণদীপ
বলেছিল—শুভেন্দুদা অতীত নিয়ে মন খারাপ করা নয়। অতীত থেকে ভালো কাজগুলো
বর্তমানে নিয়ে আসুন।

পরের অংশ ১০ পাতায়

৯

উৎস জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৬

লিমেরিটনিক

অনার্য মিত্র

১.

ভোটের পরেই ভেঙে যায় দল, ভেঙে যায় যত ঘোঁট
দলভাঙনিরা বলে : ‘আয় ভাই, বাঁধি ফের নয়া জোট।’

আবার জোটের নয়া জোটাজুটি
কেউ খোঁটা দেয়, চেপে ধরে টুটি

কী জানি, কে কবে বলবে যে কারে: ‘বেরো তুই, ব্যাটা ফোট!’

২.

কোন ফুলে আজ বেশি মধু ঝরে, কোন ফুল গেল শুকিয়ে?
মধুময় ফুলে যাবার জন্যে রয়েছে এখন মুখিয়ে।

নতুন করেই গজিয়েছে ডানা

উড়ে যেতে আর নেই কোনো মানা

এই দল থেকে সেই দলে যাব, সব মায়ামোহ চুকিয়ে।

৩.

সব দুর্নীতি চুরি জোচ্চুরি এইবারে হবে অবসান,
কোথাও যদি তোলাবাজি চলে, গুঁড়িয়ে করব খান্ খান্।

জেনে রাখ, আর কোনো ভয় নেই

দুর্নীতি নয়, সোনা ফলবেই;

বুলডোজারের আলতো ছোঁয়ায় হয়ে যাবে সব সমাধান।

৪.

এইবারে তবে চালু হয়ে গেল জোড়া ইঞ্জিন বঙ্গে
ভেসে যাই আজ তুরীয়ানন্দে, ভাসছি সুখ-তরঙ্গে।

উন্নয়নের ফল্গু ধারায়

বাংলাকে আজ কে আর হারায়,

মহা পুলকিত বঙ্গবাসীর ফুল ফোটে সারা অঙ্গে।

৫.

এখন তো আর বাধা নেই কোনো, নেই এতটুকু সংকোচ,
‘স্বচ্ছ’ অ্যাপটি নামিয়ে আমরা মনকে করছি ঝাড়পোঁছ।

খুচরো ঝামেলা আছে কিছু কিছু

তার কাছে মাথা করব না নীচু,

মিছেই যে তারা ডানা ঝাপ্টায়, ওগুলো আসলে কক্‌রোচ।

৬.

ইস্কুলে-পড়া ছেলে ছোকরারা ইদানীং বড়ো নচ্ছার
এগজামিনের খাতা দেখা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে বারবার।

মাথা নীচু করে পড়াশুনো করা

ভুলেই যাচ্ছে, এমনই বেয়াড়া,

‘পাকিস্তানী’রা ইস্কুলগুলো করে দিল ছারখার।

৭.

ডিম ছুঁড়ে ছুঁড়ে ডিম-ও-ফ্রেসিটা হচ্ছে শক্তপোক্ত,

ভোটোফ্রেসির কল্যাণে তাই হচ্ছে যা, সেটা হোক তো!

হাঁস-মুরগিরা সংকটে আজ

ডিম-নন্দিত নেতৃসমাজ

কী করে যে এত ডিম দেবে তারা, তা বোঝার নেই লোক তো!

৮.

এত দলাদলি, তবু গলাগলি কীসেরই বা এত দন্দ

‘এক দেশ এক দল’ যদি হয়, কী হবে এমন মন্দ?

বিরোধী তখন থাকবে না আর

গণতন্ত্রের সেটাই বাহার

‘এক দেশ এক ভোটের’ মতোই জীবনে আনবে ছন্দ।

উ মা

৯ পাতার পর

চলো তাই করি। একদিন এক জায়গায় জড়ো হই। লিখে হবে না। কথা বলাবলি করি।

বুঝতে হবে চারাপশ বদলে গেছে, যাচ্ছে। বদলে দেওয়া হচ্ছে। পুঁজি বদলে দিচ্ছে। বিশ্বায়নের পর পণ্যায়ন হয়েছে।

খবরের কাগজ খুললে, টিভি দেখলে, মোবাইলে চোখ রাখলে, কান পাতলে শুধুই এই কিনুন, ওই কিনুন, এটা বাড়ি নিয়ে যান, ওটা খান, সেটা ব্যবহার করুন।

একটা পণ্যময় জীবন, আকাঙ্ক্ষা, মনোযোগ। পুঁজির বানানো, পুঁজির পাশে থাকা দলদের বানানো। বয়স্কদের জন্য, ছোটোদের জন্য, মহিলাদের জন্য, পুরুষদের জন্য, এককের জন্য, পরিবারের জন্য।

আর সারাদিন হাতে আর কানে মোবাইল। চোখে আর কানে টিভি। আমাদের জন্য কোনো জায়গা নেই।

আমাদের মিটিঙ নেই, মিছিল নেই, আলোচনা সভা নেই, সমীক্ষা নেই, বই বিনিময় নেই, লেখার বিষয় ভাবা নেই।

আমরা সব হারিয়ে বসে আছি, অথচ ভাবছি না—এমন কেন হলো।

চলো ভাবি, জড়ো হই, কথা বলি, কাজে নামি, লিখি, পত্রিকা বের করি। ছোটো করে কম দামে, যুক্তাক্ষর যতটা পারা যায় বাদ দিয়ে, সহজ করে, মুখের কথায় লিখি।

চলো শুরু করি। তোমরা থাকো। আমি আছি। জ্ঞান দিলাম না। কাজের প্রস্তাব দিলাম।

উ মা

বর্ণবাদ অরণ্যলোক ভট্টাচার্য্য

শুরু করি এমেন্ট লুইস টিল নামের সেই আফ্রিকান-মার্কিন কিশোরের কথা দিয়ে। ১৯৫৫ সালের ২৮ আগস্ট, মিসিসিপি শহরে মাত্র চোদ্দ বছর বয়সের সেই কিশোরকে নৃশংসভাবে পিটিয়ে, তার হাড়গোড় ভেঙে, সবশেষে মাথায় গুলি করে মৃত্যু নিশ্চিত করে, তার শরীরটা ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাল্লাহাচি নদীতে। নদীর জলে ডুবে যাওয়া সুনিশ্চিত করতে, টিল-এর গলায় কাঁটাতার দিয়ে একটি বৈদ্যুতিন পাখা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। দিন তিনেক পরে টিলের আধপচা ফুলে যাওয়া দেহ ভেসে ওতে নদীর তীরে। কি দোষ ছিল সেই কিশোরের? সে নাকি ক্যারোলিন ব্র্যান্ট নামী জনৈক স্বেচ্ছাসেবিকা মহিলাকে তাদের মুদির দোকানে শিস দিয়ে ডেকেছিল (প্রমাণ ছিল না)। খুনীরা প্রমাণভাবে বেকসুর খালাস হয়ে যায়। তার হত্যাকাণ্ডের চরম নৃশংসতা এবং পরবর্তীতে খুনীদের আদালত থেকে খালাস পাওয়ার ঘটনাটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আফ্রিকান-আমেরিকানদের ওপর চলা দীর্ঘদিনের সহিংস নির্যাতনের ইতিহাসের দিকে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। টিল আমেরিকার নাগরিক অধিকার আন্দোলনের (Civil Rights Movement) এক মুখ হয়ে ওঠেন।

আফ্রিকান কৃষগঙ্গ মানুষদের নিয়ে, সাহিত্য সঙ্গীত বা সিনেমা বহুল প্রচলিত এবং প্রকাশিত। কিন্তু আমাদের দেশে সামগ্রিকভাবে গায়ের রং দিয়ে যেহেতু বৈষম্যের পরিমাপ অন্যান্য ক্ষেত্রে কিন্তু যথেষ্টই প্রতীয়মান। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—কোভিড অতিমারির সময়ে বিভিন্ন হাসপাতালে কর্মরত ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নার্সদের উপর তাদের চেহারা (চৈনিক সদৃশ মঙ্গোলীয় বৈশিষ্ট্য) নিয়ে কটুক্তি বা হেয় করা। সেই জন্যে জাতিসংঘ তাঁদের মতো করে, বর্ণবাদের একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন।

জাতিসংঘের মতে, বর্ণবাদ হল—জাতি, বর্ণ, বংশ, বা জাতীয় কিংবা জাতিগত উৎসের ভিত্তিতে কারও সামাজিক পৃথকীকরণ, বর্জন বা সীমাবদ্ধতা বা কারওকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

ফলস্বরূপ মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা জনজীবনের অন্য যে কোনো ক্ষেত্রে মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাকে নস্যাত করা বা ক্ষুণ্ণ করা।

শিশুস্বাস্থ্যের একটি মূল নির্ধারক হিসেবে বর্ণবাদ : বর্ণবাদ শিশুস্বাস্থ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নির্ধারক, যা স্বাস্থ্য বৈষম্যের (health inequities) একটি প্রধান কারণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) সামাজিক নির্ধারক বলতে সেই পরিবেশের কথা বলেছেন যেখানে মানুষ জন্মায়, বড় হয়, বাস করে, কাজকর্ম করে এবং বুড়ো হয়। এই পরিবেশ আবার প্রভাবিত হয় অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ইত্যাদি পরিবর্তনশীল বিষয় বা variable factors দ্বারা। এই পরিবর্তনশীল বিষয়গুলিই শেষ পর্যন্ত স্বাস্থ্যগত বৈষম্যের নির্ণায়ক হয়ে ওঠে। এই ধরনের স্বাস্থ্য বৈষম্য মানুষের ব্যক্তিগত অভ্যাস বা জিনগত কারণের জন্য নয়; বরং বর্ণবাদই এর জনক।

বর্ণবাদ যে মানুষের সামগ্রিক স্বাস্থ্যের (শারীরিক ও মানসিক) একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক—এই নিয়ে বেশিরভাগ দেশেরই কোনও সম্যক ধারণা নেই। শিশুস্বাস্থ্য আলাদা করে ভাবার তো প্রশ্নই নেই। আমেরিকা বা ইউরোপীয় দেশগুলিতে, যদিও বা এ নিয়ে ভাবনা চিন্তা হয়, আমাদের দেশে সেটাও খুব কম। ফলত শিশুস্বাস্থ্যের উপর বর্ণবাদের প্রভাব সংক্রান্ত পরিসংখ্যান প্রায় নেই বললেই চলে। অন্যান্য দেশের পরিসংখ্যানে একবার চোখ বোলানো যাক।

• মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের *Centers for Disease Control and Prevention (CDC)* প্রকাশিত ইশতেহারে দেখা যাচ্ছে যে, ২০০৭-২০১৬ এই সময়কালে, আফ্রিকান-আমেরিকান নারীরা গর্ভাবস্থা সংক্রান্ত জটিলতায়, স্বেচ্ছাসেবিকা আমেরিকান নারীদের তুলনায় প্রায় তিনগুণ বেশি মৃত্যুর ঝুঁকিগ্রস্ত ছিলেন।

• ২০২১ সালের *King's Fund*-এর এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে ২০০৭ সালের পর থেকে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে মৃত জন ও শিশুমৃত্যুর হার কমলেও, জাতিগত সংখ্যালঘুদের মধ্যে শিশুমৃত্যু হার তখনও যথেষ্ট বেশি। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৭-২০১৯ সময়কালে পাকিস্তানি ও আফ্রিকান বংশোদ্ভূতদের মধ্যে শিশুমৃত্যু হার ছিল যথাক্রমে প্রতি ১০০০ জীবিত শিশুর মধ্যে ৬.৮ ও ৬.৫, যেখানে ইউরোপীয় বংশোদ্ভূতদের ক্ষেত্রে তা ছিল মাত্র ৩.২।

• দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ টাউনের স্কুলে ২০০৯ সালে ১৪-১৫ বছর বয়সী শিশুদের উপর পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার (PTSD) হওয়ার সম্ভাবনা ছিল ইউরোপীয় জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৬ ১১

বংশোদ্ভূত শিশুদের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ।

• অস্ট্রেলিয়া সরকারের একটি বিশ্লেষণে (২০০৮-২০১২) দেখা যায়, আদিবাসী এবং টোরেস স্ট্রেট দ্বীপপুঞ্জের জনগোষ্ঠীর পুরুষ ও নারীদের গড় আয়ু, আদিবাসী নন এমন জনগোষ্ঠীর তুলনায় যথাক্রমে ১০.৬ ও ৯.৫ বছর কম।

• ১৯৯৭-২০১৪ সময়কালের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ক্যামেরগনের বাকী পিগমি জনগোষ্ঠীর মানুষ, অ-পিগমি জনগোষ্ঠীর তুলনায় প্রায় ২২ বছর আগে মারা যান।

• জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক বিভাগের ২০১৮ সালের *State of the World's Indigenous Peoples* প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইকুয়েডরে আদিবাসী শিশুদের মধ্যে শিশু মৃত্যুহার প্রতি ১০০০ জীবিত শিশুর মধ্যে ৬৭.৬, যেখানে সাধারণ জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে তা ৩০.০ (২০১১ সালের জনগণনার ভিত্তিতে)।

• ভিয়েতনামে ২০০২ সালে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুহার ছিল প্রতি ১০০০ জীবিত শিশুর মধ্যে ৪১, যেখানে আদিবাসী নয় এমন জনগোষ্ঠীর মধ্যে ২৮।

• চীনে ২০০৫-২০০৭ সময়কালে Prospective Urban and Rural Epidemiology (PURE) সমীক্ষায় দেখা যায়, চীনের জাতিগত সংখ্যালঘুদের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপের হার ছিল ৪২.৪%, যেখানে হান চীনা জনগোষ্ঠীর মধ্যে তা ছিল ৩৪.৪% এবং সেই উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসার হারও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্টই কম।

• একটি গবেষণায় বলা হয়েছে যে, ২০০৬ সাল পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, পিগমি জনগোষ্ঠী (যেমন মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রের আকা এবং উগান্ডার তুয়া)-র মধ্যে শিশু মৃত্যুহার প্রতিবেশী অ-পিগমি জনগোষ্ঠীর ১.৫ থেকে ৪ গুণ বেশি।

• ২০১৪ সালের ইউরোপীয় কমিশনের একটি প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, ইউরোপের রোমা জনগোষ্ঠীর গড় আয়ু অ-রোমা জনগোষ্ঠীর তুলনায় প্রায় ১০-১৫ বছর কম।

• ২০১০ সালের তানজানিয়া ডেমোগ্রাফিক ও হেলথ সার্ভে অনুযায়ী, Maasai পশুপালক সম্প্রদায়ের ৫৯ শিশু খর্বকায় (stunted), এবং তাদের মধ্যে জুর, ডায়রিয়া ও নিউমোনিয়ার হার অন্যান্য প্রধান জাতিগোষ্ঠীর তুলনায় বেশি। এছাড়া ২০১৮ সালের তানজানিয়া ন্যাশনাল নিউট্রিশন সার্ভেতেও দেখা যায় যে, আদিবাসী অধ্যুষিত Manyara অঞ্চলে খর্বতার হার বেশি (৩৬.১%)।

• ২০১০ সালের ব্রাজিলিয়ান ন্যাশনাল ডেমোগ্রাফিক

সেনসাস বিশ্লেষণে প্রকাশিত হয়, শহর এবং গ্রাম নির্বিশেষে, ২০ বছরের কম বয়সী আদিবাসী শিশু ও কিশোরদের মৃত্যুহার অ-আদিবাসী জনগোষ্ঠীর তুলনায় বেশি।

• নাইজেরিয়ার ২০০৩ সালের ডেমোগ্রাফিক ও হেলথ সার্ভের বিশ্লেষণে দেখা যায়, হাউসা বা ফুলানি মায়েদের সন্তানদের তুলনায় ঈগবো, যরুবা এবং অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর সন্তানদের মৃত্যুঝুঁকি যথাক্রমে ৪০%, ৫৭% ও ১৯% কম।

তার মানে, বর্ণবাদ শিশু এবং কিশোরদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য দুটিকেই ভয়ানকভাবে প্রভাবিত করে। আবার শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের উন্নয়ন একে অপরের পরিপূরক। একটি আরেকটির উন্নয়নকে প্রভাবিত করে।

বর্ণবাদের মানসিক প্রভাব: বর্ণবাদ যে শুধু শিশুদের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাই নয়, শিশু মনজমিনেও তার প্রভূত প্রভাব। যেসব শিশু সরাসরি বর্ণবাদের শিকার হয়, সন্দেহাতীতভাবে তাদের ওপরেই সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ে। কিন্তু যারা সেই নিপীড়ন প্রত্যক্ষ করে (bystander), তারাও কিছু কম ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

এমন অভিজ্ঞতা মনের অবচেতনে শারীরিক ও মানসিক বিকারের কারণ ঘটায়, ঠিক যেমনটি হয় বড় কোনো দুর্ঘটনার পরে উদ্ধারকর্মীদের মানসিক অবস্থা।

এই বর্ণবাদ যখন বৃহদাকারে জাতিগতরূপ ধারণ করে, তার নেতিবাচক ধারণা (stereotype) ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাস কমাতে শুরু করে এবং ‘stereotype threat’ তৈরি করে—অর্থাৎ নিজের জাতি সম্পর্কে হীনমন্যতা সৃষ্টি করে। এতে পড়াশোনা ও কাজের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। দেখা গেছে, গণিতের একটি পরীক্ষায় মেয়েদের একটি কলেজে লিঙ্গ উল্লেখ করতে নির্দেশ দেওয়া আছে, অন্য আরেকটি কলেজে সেই নির্দেশিকা নেই। যে কলেজ ছাত্রীরা সেটির উল্লেখ করেছে, তারা অন্যদের তুলনায় খারাপ ফল করেছে। এ ক্ষেত্রে লিঙ্গের উল্লেখটি সংশ্লিষ্ট ছাত্রীদের মনে একটি ‘stereotype threat’ সৃষ্টি করেছে।

বর্ণবাদ ও মাতৃ-শিশু স্বাস্থ্যের বৈষম্যের সংক্ষিপ্তসার
• সংখ্যালঘু শিশুদের বেশি মৃত্যুহার • প্রসবকালীন সুযোগ-সুবিধার ঘাটতি • গর্ভাবস্থায় প্রযুক্তি (টিকা, চেক আপ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা) ব্যবহারের সুযোগ গ্রহণের বৈষম্য • অঙ্গ প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্য • ওষুধ বন্টনে বৈষম্য • কম সংখ্যক ক্যান্সার-জরী শিশু • বেশি সংখ্যায় স্থূলতা ও হাঁপানির মতো রোগ।

এমনকি শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও স্বেচ্ছাশ্রম ও সংখ্যালঘুদের মধ্যে বৈষম্য দেখা যায় : •সংখ্যালঘু শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ গ্রহণের কম সুযোগ সুবিধা •মানসিক ও আচরণগত সমস্যার নির্ণয় ও চিকিৎসায় বৈষম্য। **শিশুমনে বর্ণবৈষম্যের প্রভাবের বীজ বপন :** বিজ্ঞানের মনে সমগ্র মানবজাতি আসলে একটাই জীব বৈজ্ঞানিক জাতি। গায়ের বা চোখের রং, চুলের ধরণ বা হাড়ের গঠনের মতো বাহ্যিক পার্থক্য দিয়ে আলাদা ‘জাতি’ নির্ধারণ করা যায় না। মানুষের জিনগত গঠনে প্রায় ৯৯.৯% মিল রয়েছে।

কিন্তু অদ্ভুতভাবে মানুষকে এই সামান্য (০.০১%) পার্থক্যের ভিত্তিতেই ভাগাভাগি করার চেষ্টা এখনো চলছে, যা কিনা বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও চিকিৎসাক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ফলে প্রকৃত সমস্যাগুলো (যেমন সামাজিক বৈষম্য) দূর করার বদলে আমরা শুধু তার ফলাফল নিয়েই বেশি পর্যালোচনা করি, এবং মূল সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে, আবার সেই জীববৈজ্ঞানিক কারণের আবেশে ঢুকে পড়ি। শিশুরা খুব ছোটবেলাতেই গায়ের রং বা চেহারার পার্থক্য অনুধাবন করতে পারে। মিশ্র সমাজে এই পার্থক্যগুলোর যে কোনও অস্বাভাবিকতা নেই, সেই ধারণা শিশুমনে প্রোথিত করা খুব জরুরি। শিশুর স্বাস্থ্যের ওপর বর্ণবাদের প্রভাব বুঝতে হলে জানতে হবে যে বর্ণবাদ ৩টি স্তরে কাজ করে— ১) প্রাতিষ্ঠানিক (যেমন সরকার, স্কুল, ব্যাংক, আদালত ইত্যাদি)। ২) ব্যক্তিগত (একজনের প্রতি অপরের বৈষম্যমূলক আচরণ)। ৩) অন্তর্নিহিত (নিজের সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা তৈরি হওয়া)।

শিশুর লিঙ্গ, ধর্ম, অভিবাসী অবস্থা, জীবনযাপন, শিক্ষা, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং আইনি অধিকার —সবকিছুর ওপর প্রাতিষ্ঠানিক বর্ণবাদের প্রভূত প্রভাব। ব্যক্তিগত বর্ণবাদ (যেমন কারওর শারীরিক ক্ষমতা বা বুদ্ধি বা আচরণ নিয়ে জাতির ভিত্তিতে ধারণা সৃষ্টি করা) স্বাস্থ্যসেবা ও সামগ্রিক স্বাস্থ্যের ওপর খারাপ প্রভাব ফেলে। প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত বর্ণবাদের অভিজ্ঞতা থেকে শিশুদের মধ্যে **অন্তর্নিহিত বর্ণবাদ** তৈরি হয়, অর্থাৎ তারা নিজের বা স্বজাতি সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণ শুরু করে।

প্রতিকার: যেহেতু শিশুস্বাস্থ্যে বর্ণবাদের প্রভাব বিস্তারে ভূমিকায় ভৌগোলিকতা এবং আঞ্চলিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, সেহেতু এর প্রতিকারের খসড়াপত্রও জায়গাভিত্তিক হওয়াটা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, আমেরিকা বা ইউরোপ বা আফ্রিকার কয়েকটি দেশ ছাড়া, এ নিয়ে খুব একটা উচ্চবাচ্য কেউ করেন না। ভারতের সংবিধানের

১৪, ১৫ এবং ১৭ অনুচ্ছেদের অধীনে জাতি, বর্ণ বা জাতিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে বৈষম্য করা নিষিদ্ধ। পরোক্ষ যার লক্ষ্য হল শিশুদের অধিকার রক্ষা করা। তা সত্ত্বেও, বর্ণিক এবং আঞ্চলিক বৈষম্য শিশুদের স্বাস্থ্যের ওপর প্রভূত প্রভাব ফেলে, যার ফলে প্রান্তিক গোষ্ঠী এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি আদৌ সন্তোষজনক নয়। কিন্তু এর কোনও বিজ্ঞানভিত্তিক প্রতিকারের রাস্তা আমাদের দেশে আজও তৈরি হয় নি। তাই আমেরিকান অ্যাকাডেমি অফ পিডিয়াট্রিক্স (AAP) কৃত নির্দেশিকাটি সাধারণের বোঝার সুবিধার জন্য নীচে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম।

শিশু এবং কিশোর-কিশোরীদের ওপর বর্ণবাদের প্রভাব প্রশমনে বিশেষজ্ঞদের ভূমিকা : শিশু বিশেষজ্ঞ এবং অন্যান্য শিশু স্বাস্থ্যকর্মীদের অবশ্যই সব জাতির পরিবারের সাথে বর্ণবাদের প্রভাব নিয়ে আলোচনা ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। সে বর্ণবাদের শিকার হওয়া শিশু বা তার পরিবার হোক, যে কোনও প্রত্যক্ষদর্শী হোক বা এর নৈপথ্যে থাকা অন্য যে কেউ হোক না কেন। শিশু বিশেষজ্ঞ ও স্বাস্থ্যকর্মীদের কর্মক্ষেত্রে এমন পরিবেশ তৈরি করতে হবে যেখানে সব রোগী এবং তাঁদের পরিবার স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। তাঁদের সঙ্গে শ্রদ্ধাশীল ব্যবহার এবং সর্বোচ্চ মানের চিকিৎসা প্রদান নিয়ে যেন কোনও সন্দেহের অবকাশ না থাকে। শিশু বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগের মাধ্যমে, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর সাথে মিলে স্বাস্থ্য, বিচার এবং শিক্ষা ব্যবস্থার বৈষম্য ও পক্ষপাত দূর করতে, একসঙ্গে কাজ করতে পারেন।

সর্বোত্তম চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান : এমন একটি নিরাপদ চিকিৎসাকেন্দ্র গড়ে তোলা, যেখানে স্বাস্থ্যসেবীরা শিশু ও তাদের পরিবারের ওপর বর্ণবাদের প্রভাব সম্পর্কে সচেতন থাকবেন। তাদের চিকিৎসায় সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করা এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বর্ণবাদ মোকাবিলা করার মানসিকতা থাকা জরুরি।

বর্ণবাদে আক্রান্ত শিশু ও তাদের পরিবারগুলোকে **সঠিক দিকনির্দেশ** করা, যাতে তারা — ১. সূক্ষ্ম থেকে স্কুল, সব ধরনের বর্ণবাদ অনুধাবন করতে পারে। ২. সাধারণ মানসিক চাপ বা অন্যায় আচরণ থেকে বর্ণবাদকে আলাদা করতে পারে। ৩. নেতিবাচক বার্তা বা আচরণের প্রতিবাদ করতে পারে। ৪. সেই নেতিবাচক অভিজ্ঞতা কাটিয়ে উঠে কিছু ইতিবাচক কাজকর্ম করতে পারে।

• সাংস্কৃতিক ও ভাষাগতভাবে উপযুক্ত সেবা প্রদানের

জাতীয় মানদণ্ড বা নির্দেশিকা অনুযায়ী ক্লিনিক ও অফিসের কর্মীদের বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা। • বর্ণবাদের সাথে সম্পর্কিত সামাজিক সমস্যাগুলো (যেমন: অনিরাপদ এলাকা, দারিদ্র্য, আবাসন বৈষম্য এবং শিক্ষার সুযোগের অভাব) মূল্যায়ন করা, যাতে পরিবারগুলোকে প্রয়োজনীয় সহায়তার সাথে যুক্ত করা যায়। • যাঁরা বর্ণবাদের শিকার হয়েছেন, তাঁদের মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা (যেমন: ট্রমা, উদ্বেগ, শোক বা বিষণ্ণতা), বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া এবং প্রয়োজনে উন্নত মানসিক স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা করা। • কিশোর-কিশোরীদের মানসিক ইতিবাচক বিকাশের উপায়গুলো খুঁজে বার করতে হবে। যার মধ্যে ‘সুস্থ সাংস্কৃতিক সামাজিকীকরণ’ হয়ত একটি। এর মাধ্যমে একটি পরিবারের সদস্যদের অন্যত্র সাহায্যের হাত বাড়ানোয় উৎসাহ প্রদান। যা আখেরে বর্ণবাদী আচরণের ঘা শুকোতে সাহায্য করে। শিশুদের প্রারম্ভিক সাক্ষরতা কর্মসূচিতে (early literacy programmes) সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য থাকা বাঞ্ছনীয়। এমন বই বা গল্প বাছতে হবে, যেখানে বিভিন্ন জাতির লেখক, ছবি এবং প্রেক্ষাপট প্রতিফলিত হয়। • চিকিৎসা ক্ষেত্রে বর্ণবাদের প্রভাব মোকাবিলায় কোন পদ্ধতিগুলো সবচেয়ে ভাল কাজ করে, তা যাচাই করতে স্থানীয় অফিস এবং ক্লিনিকগুলোকে গবেষণা ও মান-উন্নয়নমূলক প্রকল্পে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করতে হবে। • পরিবারগুলোর নাগরিক অধিকার (Civil Rights) নিয়ে কোনো উদ্বেগ থাকলে তাদের আইনি সহায়তা দেওয়া বা যথাযথ সংস্থার কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করা। • হাসপাতাল বা ক্লিনিকগুলোর নিয়মিত অভ্যন্তরীণ মান যাচাই করা। জাতিভেদে চিকিৎসার মান বা রোগীর সন্তুষ্টিতে কোনো পার্থক্য হচ্ছে কি না তার নিয়মিত বিশ্লেষণ এবং জনগণের আস্থা ফেরাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়াটাও জরুরি।

কর্মীদের পেশাগত শিক্ষা ও দক্ষতার উৎকর্ষতা বাড়ানো:

শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিগুলিতে সদর্থক ভূমিকা নিতে হবে। বিভিন্ন শিশুদের সঙ্গে এবং তাদের পরিবারের সঙ্গে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পারিবারিক যোগাযোগ গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা থাকা দরকার।

এমন নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে, যা পারস্পরিক অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে, একটি গোষ্ঠী গড়ে তুলতে সাহায্য করবে এবং আত্মসম্মানকে উৎসাহিত করবে— যেমন আত্মসচেতনতা, সারা জীবন ধরে আত্মমূল্যায়নের অঙ্গীকার এবং ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা সামাল দেওয়ার প্রতিশ্রুতি। পাশাপাশি অনুশীলনভিত্তিক প্রশিক্ষণেরও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে নতুন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞরা, রোগী

ও তাদের পরিবারকে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে দক্ষ হয়ে উঠতে পারেন।

সক্রিয় শিক্ষণ-পদ্ধতি—যেমন অনুশীলনভিত্তিক প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত নীতিমালা পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যাতে শিশুরোগ বিদ্যায় প্রশিক্ষণরত চিকিৎসকেরা দেশের বৈচিত্র্যময় এবং বিবিধ শিশুজনগোষ্ঠীকে সেবা দেওয়ার জন্য যথাযথভাবে প্রস্তুত হতে পারেন।

এমন নীতি ও কর্মসূচি রূপায়ন করতে হবে, যা শিশু চিকিৎসায় কর্মরত স্বাস্থ্যকর্মীদের আরও দক্ষ করে তোলে এবং কর্মরত শিশুরোগ বিশেষজ্ঞদের জন্য ধারাবাহিক পেশাগত শিক্ষার ব্যবস্থা করে। এর ফলে অবচেতন পক্ষপাত কিছুটা হলেও, কমানো সম্ভব হবে এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ব্যবস্থায় নিরাপত্তা ও সেবার মান উন্নত হবে।

গোষ্ঠী বা কমিউনিটির অংশগ্রহণ, অধিকার-সমর্থন এবং জননীতির মাধ্যমে ব্যবস্থার সর্বোত্তম উন্নয়ন সাধন —

এ কথা অনস্বীকার্য যে, বর্ণবাদের মোকাবিলা তখনই সম্ভব যখন অন্যান্য সমমনস্ক প্রতিষ্ঠানের কাজের অংশীদার হয়ে, একত্রিত হয়ে কাজ করা যাবে।

দারিদ্র্যপীড়িত এলাকার শিশুদের মধ্যে স্থূলতা ও অপুষ্টিজনিত বৈষম্য কমাতে হলে, গোষ্ঠী বা সমাজপতিদের উপযুক্ত খেলার মাঠ এবং সুখম খাদ্যবাজার গড়ে তুলতে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে।

সকল শিক্ষার্থীর পেশাগত সাফল্য ও শিক্ষাগত অগ্রগতি নিশ্চিত করতে, শহরাঞ্চল, শহরতলি ও গ্রামীণ সম্প্রদায়ের পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর শিক্ষার মানোন্নয়নের দিকে নজর দিতে হবে।

স্কুলের কর্মীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন ও সহযোগিতার মাধ্যমে স্থানীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চিকিৎসকদের ও স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য নির্দেশিকা প্রস্তুত করতে হবে, যা তাদের স্কুল ব্যবস্থা ও স্কুলকর্মীদের সঙ্গে যুক্ত সাহায্য করে।

গায়ের রঙের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের অসম হারে বহিষ্কার ও সাময়িক বরখাস্তের ঘটনাগুলি শিক্ষাব্যবস্থার একটি প্রাতিষ্ঠানিক পক্ষপাতের প্রতিফলন। বিদ্যালয়গুলিতে এই অবচেতন পক্ষপাত (implicit bias) দূর করতে, শিক্ষকদের সাংস্কৃতিকভাবে সংবেদনশীল বিদ্যালয় পরিচালনার কার্যকর প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নীতির পক্ষে সমর্থন বাড়াতে হবে। এর ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্য হ্রাস

পাবে এবং বর্ণভিত্তিক পক্ষপাতের প্রবণতা কমে আসবে।

ক্লাসে ঝামেলা করা ছাত্রদের এবং বর্ণবাদ ভিত্তিক বৈষম্যজনিত কারণে স্কুল থেকে বহিষ্কার করার কুশীলবদের আরও বেশি করে মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবার আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

বহু সাংস্কৃতিক ও বহুভাষিক পাঠ্যক্রম চালু করা। তার ফলে বিভিন্ন রকম সাংস্কৃতিক আবহে বড় হওয়া শিশুরা কখনই বিচ্ছিন্ন বোধ করবে না। এই অনুভূতি একটি শিশুর সার্বিক বিকাশের সহায়ক।

শিক্ষাক্ষেত্রে বর্ণবাদ মোকাবিলায় কার্যকর ও গবেষণাভিত্তিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা জরুরি। কেতাবি নীতিমালা বৈজ্ঞানিক গবেষণার অনুমোদনসাপেক্ষ।

যেসব সম্প্রদায় বর্ণবৈষম্যে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত, সেইসব সম্প্রদায়ের মানুষদের সঙ্গে একযোগে সম্প্রদায়ভিত্তিক জনসচেতনতা ও অধিকার আদায়ের উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে হবে, যাতে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা-সহায়ক নীতিমালা গড়ে তোলা যায়।

উন্নত গবেষণা

নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ নিয়ে নিবিড় গবেষণার জন্য তহবিল গঠন এবং সেই গবেষণার ফলাফল ব্যাপকভাবে প্রচারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে—

১. বর্ণবাদ বৈষম্যের প্রত্যক্ষ অথবা অনুভূত অভিজ্ঞতা শিশু ও পরিবারের স্বাস্থ্যের ওপর কী ধরনের প্রভাব ফেলে।
২. নিজস্ব জাতিগত পরিচয় নির্ণয়ন এবং অন্যদের দৃষ্টিতে তার জাতিগত পরিচয়ের ফারাক শিশুদের স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও তার ফলাফলের ওপর কী রকম প্রভাব বিস্তার করে।
৩. স্বাস্থ্যকর্মীদের কর্মদক্ষতা, রোগীর সন্তুষ্টি, আস্থা, স্বাস্থ্যসেবা এবং শিশুস্বাস্থ্যের ফলাফলের ওপর কী প্রভাব ফেলে।
৪. নীতিগত পরিবর্তন এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক উদ্যোগ, যুব-উন্নয়ন, বিকাশ ও স্বাস্থ্যের ওপর বর্ণবাদ ও অন্যান্য বৈষম্যের ক্ষতিকর প্রভাব কতটা কমাতে সক্ষম।
৫. সামান্য জিনগত পার্থক্য বা দেশের ভিত্তিতে মানুষকে শ্রেণিবদ্ধ করার পরিবর্তে, জিনোম ভিত্তিক জৈব-চিহ্ন (বায়োমার্কার) শনাক্ত করে, তার ভিত্তিতে মানব স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন।

উপসংহার:

বর্ণবাদের মূল কারণগুলিকে মোকাবিলা করার জন্য সুনির্দিষ্ট ও লক্ষ্যভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে, স্বাস্থ্যব্যবস্থার বৈষম্য আরও প্রকট হবে। শিশু চিকিৎসক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য

স্বাস্থ্যকর্মীদের সক্রিয় অংশগ্রহণমূলক এবং কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কার্যকর জননীতি প্রণয়ন, উন্নত চিকিৎসাসেবা প্রদান এবং সামাজিক পরিবর্তন সাধন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমেই সমাজের গভীরে শেকড় গজানো বর্ণবাদের প্রভাবকে ধীরে ধীরে দূর করা সম্ভব হবে, যা শিশুদের স্বাস্থ্যের ওপর প্রভূত নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

আত্মসমীক্ষণ এ ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ। শিশুরোগ বিশেষজ্ঞদের নিজেদের অন্তর্নিহিত পক্ষপাতকে আত্মসমালোচনার মাধ্যমে চিহ্নিত ও স্বীকার করতে হবে। পাশাপাশি, শিশু, কিশোর এবং তরুণদের সর্বোত্তম মানসিক ও শারীরিক বিকাশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে চিকিৎসা, অর্থনীতি, পরিবেশ, আবাসন, বিচারব্যবস্থা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে সমতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে উদ্ভাবনী নীতি ও সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সমন্বিত অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি।

সূত্র :

১. World Health Organization. Strengthening primary health care to tackle racial discrimination, promote intercultural services and reduce health inequities. World Health Organization; 2022.
২. Kliegman R, Stanton B, St Geme JW, Schor NF, Behrman RE, Nelson WE. Nelson Textbook of Pediatrics. 21st ed. Philadelphia, PA: Elsevier Inc.; 2025
৩. Pachter LM, Coll CG. Racism and Child Health: A Review of the Literature and Future Directions. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics [Internet]. 2009 Jun;30(3):255–63. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2794434>
৪. Cotton NK, Shim RS. Social Determinants of Health, Structural Racism, and the Impact on Child and Adolescent Mental Health. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 2022 May;61(11).
৫. Delan Devakumar, Gram L, English S, Thilagawathi Abi Deivanayagam, Huq M, Das P. Racism and health inequity: a global syndemic for children—the Lancet Commission on racism and child health. The Lancet [Internet]. 2024 Oct 1; Available from: [https://www.thelancet.com/journals/lan-cet/article/PIIS0140-6736\(24\)02358-4/abstract](https://www.thelancet.com/journals/lan-cet/article/PIIS0140-6736(24)02358-4/abstract)
৬. Herrera MT, Girma B, Ghassabian A, Trasande L. Environmental Racism and Child Health. Academic Pediatrics [Internet]. 2024 Oct 18;24(7):S167–72. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876285923003674>

গিগ কর্মীভাইরা সহানুভূতি ও মনোযোগ দাবি করে

শ্রীনিবাস মাধব

লেখক পেশায় আইনজীবী। স্বচ্ছতা ও সাম্যের অধিকার নিয়ে কাজ করেন। ৫১এবিআই ফাউন্ডেশন নামে এক সংগঠনের সহ-প্রতিষ্ঠাতাও।

গিগ মানে স্বল্পকালীন, অস্থায়ী বা স্বাধীন কোনো কাজ। আসলে একটি অশিষ্ট সাঙ্গীতিক পরিভাষা। মিউজিশিয়ান বা কমেডিয়ানের একক মঞ্চ অনুষ্ঠানকে বলে গিগ। পরে এটা নির্দিষ্ট কাজভিত্তিক বা স্বাধীনভাবে কোনো কাজ (মূলত অ্যাপের মাধ্যমে) বা অস্থায়ী চাকরির ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হতে থাকে। আমাদের এখন অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট থেকে জোমাটো, সুইগি ইত্যাদি অসংখ্য অনলাইন ডেলিভারি সংস্থাকে নিয়ে নিত্যদিনের গেরস্থালি। এমনকি অর্ডার দেওয়ার ১০-১৫ মিনিটের মধ্যেই ওরা দিয়ে যায় কাঙ্ক্ষিত খাবার বা অন্য জিনিস। গিগ কর্মীদের বড় শত্রু সময়। একটু দেরি হলে গ্রাহক বিরক্ত হয়, নালিশে চাকরিতে ছেদ পড়তে পারে বা জরিমানা। অথচ অসংখ্য তরুণ-তরুণীর এখন রোজগারের ভরসা এই কর্মীদের সুখ-দুঃখ, বিপদ-আপদ এবং সেই সঙ্গে ওদের প্রকৃত অবস্থা জানিয়ে আমাদের কিছুটা সংবেদনশীল করে তুলতে কলম ধরেছেন শ্রীনিবাস মাধব।

ভারতেও গিগ অর্থনীতি দ্রুত বাড়ছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে কাজ করতে গিয়ে আহত হওয়ার ঝুঁকিও। ২০২০-’২১ সালে গিগ কর্মীদের সংখ্যা ছিল ৭৭ লাখ। ২০২৫-’২৬-এর অর্থনৈতিক সমীক্ষা বলছে, ২০২৪-’২৫-এ সেটা পৌঁছে গিয়েছে ১ কোটি ২০ লাখের কাছাকাছি। নীতি আয়োগ এবং কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রকে যৌথ দাবি, ২০২৯-’৩০ সালে সংখ্যাটা ২ কোটি ৩৫ লাখে পৌঁছে যাবে এবং ২০৪৭-এ ৬ কোটি ২০ লাখ ছুঁয়ে ফেলবে! এই কর্মক্ষেত্রে মেয়েদের সংখ্যা ২৮ শতাংশের কাছাকাছি এবং প্রায় ৪০ শতাংশ প্রতি মাসে রোজগার করে ১৫ হাজার টাকারও কম। অথচ ২০২৯-’৩০ অর্থবর্ষে এই ক্ষেত্রটির জিডিপি-তে অবদান হবে ২ লাখ ৩৫ হাজার কোটি টাকা।

এই সব সংখ্যাতত্ত্বের আড়ালে রয়ে গিয়েছে বিশাল কর্মীসংখ্যা, যে কর্মীদের পর্যাণ্ড নিরাপত্তা, সুসংহত বিমা বা প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি ছাড়াই বড় ধরনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে বাধ্য হতে হয়।

৭ এপ্রিল হায়দ্রাবাদে দুই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া, শিবা ও সন্দীপ, জিনিস পৌঁছে দেওয়ার পর বাড়ি ফিরছিল। ওরা রাতের দিকে কাজ নিয়েছিল পরিবারকে অর্থনৈতিকভাবে কিছুটা সুরাহা করে দিতে। দুর্ভাগ্যক্রমে এক মন্তু চালক ওদের মোটরসাইকেলকে ধাক্কা মারে, নিহত হয় দুজনেই। ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২৫ বছর বয়সী হেম শঙ্কর দিল্লিতে নিহত হয় রাত তিনটের সময়। তীব্র গতিতে ছুটে আসা একটি গাড়ি ওঁর ই-স্কুটারটিকে পিছন থেকে ধাক্কা মেরেছিল।

যে সব গ্রাহক অর্ডার করেছিলেন, তাঁরা হয়ত জিনিসটা হাতে পাওয়ার বদলে বড়জোর একটা অর্ডার বাতিলের বার্তা পাবেন। তাঁরা কখনও জানতেও পারবেন না যে, তাঁদের অর্ডারমারফিক জিনিস পৌঁছে দিতে গিয়েই মৃত্যু হয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের।

মৃত্যুর ঘটনা কম হতে পারে, তবে দুর্ঘটনা বা দুর্ভোগ মোটেও কম হয় না। পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং পিএআইজিএএম এক সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছে, বেশিরভাগ (৯৯.৩) গিগ কর্মীই কোমর ও পায়ের যন্ত্রণা থেকে অনিদ্রার মতো শারীরিক সমস্যায় ভোগেন। এর পাশাপাশি কর্মীরা অ্যালগরিদমিক কন্ট্রলের ভয়ে সারাক্ষণ তটস্থ থাকেন। কারণ এর ফলে কর্মীদের অ্যাকাউন্ট নিষ্ক্রিয় (ডিঅ্যাক্টিভেট) হয়ে যেতে পারে, মানে কাজটি যেতে পারে বা কোনও কারণ না দর্শিয়েই উৎসাহভাতা (ইনসেন্টিভ) কাটা পড়তে পারে।

২০২০-র সামাজিক নিরাপত্তা বিধি এখন কার্যকর হওয়ায়, গিগ কর্মীদের একটি আলাদা শ্রেণী হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সেই অনুযায়ী কোম্পানিগুলোকে বার্ষিক লেনদেনের ১-২ শতাংশ থেকে পাঁচ শতাংশ পর্যন্ত সরকারি ওয়েলফেয়ার (কল্যাণ) তহবিলে দিতে হবে কর্মীদের জীবন বিমা, দুর্ঘটনা, স্বাস্থ্য এবং মাতৃত্বকালীন সুবিধা, বয়সকালীন নিরাপত্তা এবং শিশুদের দেখাশোনার খাতে।

যদিও সামাজিক নিরাপত্তা বিধি (কেন্দ্রীয়) আইন ২০২৫ বলছে, একজন গিগ কর্মীকে এই সুবিধা পেতে কম করেও

৯০ দিন কাজ করতেই হবে। এদিকে জানুয়ারি মাসে নয়ডায় ১৮ বছরের অঙ্কুশ কাজের প্রথম দিনই নিহত হন। তাই জীবন বিমা ও ক্যাশলেস জরুরি চিকিৎসার ব্যাপারে দিন গোনাও নি না করে একেবারে প্রথম দিন থেকেই চালু হওয়া উচিত।

নিবেদিতপ্রাণ গিগ কর্মীদের জন্য আইন প্রয়োগের ব্যাপারে এপ্রিল মাসে তেলেঙ্গানা হাত মিলিয়েছে রাজস্থান, কর্ণাটক, বিহার ও ঝাড়খণ্ডের সঙ্গে। তেলেঙ্গানা প্ল্যাটফর্ম-বেসড গিগ ওয়ার্কাস (রেজিস্ট্রেশন, সোশ্যাল সিকিওরিটি অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার) আইন মোতাবেক কোনও কর্মীর যোগদানের প্রথম দিনই দুর্ঘটনাজনিত কারণে মৃত্যু হলে, সেই বিষয়ক সমস্ত সুবিধা সে পাবে। সহায়তা তহবিলের অর্থ অন্য খাতে চলে যাওয়া ঠেকাতে আইনে রিয়েল-টাইম ডিজিটাল ভেরিফিকেশন-এর প্রস্তাবও রাখা হয়েছে।

২০২৩ সালে ওয়েলফেয়ার বোর্ড মডেল তৈরি করায় রাজস্থান পথিকৃৎ হয়ে আছে। তারা সামাজিক নিরাপত্তা তহবিলের জন্য লেনদেনের আগেই শুল্ক (প্রি-ট্রানজাকশন সারচার্জ) চালু করেছে। কর্ণাটক সরকার অ্যালগরিদম কীভাবে ভাড়া নির্ধারণ করে বা কাজ ঠিক করে দেয়, তা জানার অধিকার (রাইট টু নো) কর্মীদের দিয়েছে।

বিহারে আইন মাফিক মাতৃত্বকালীন এবং দুর্ঘটনাজনিত সুবিধা নিশ্চিত করতে অ্যালগরিদম-এর সিদ্ধান্ত মানুষের দ্বারা পুনর্যচাইয়ের সুযোগও রেখেছে। ঝাড়খণ্ড বাধ্যতামূলকভাবে রাজ্য জুড়ে ই-শ্রম-এর সঙ্গে সুসংহত নথিভুক্তিকে গুরুত্ব দিচ্ছে। কাউকে কাজ থেকে বরখাস্ত করতে গেলে সাতদিন আগে লিখিত নোটিশ দিতে হবে, এই নিয়ম চালু করেছে তেলেঙ্গানা। কর্ণাটকে এই নোটিশের সময়কাল ১৪ দিন।

গিগ কর্মীদের সব বিপদ যে রাস্তাতেই এমন নয়। ২০২৩-এ হায়দরাবাদে ডেলিভারি দিতে গিয়ে গ্রাহকের হিংস্র কুকুরের হাত থেকে বাঁচতে চারতলার উপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যু হয় মহম্মদ রিজওয়ানের। এছাড়াও কোনও বাড়িতে টিমটিমে আলো, কোথাও বিপজ্জনক সিঁড়ি বা ঠিকঠাক কাজ না করা লিফটের মতো সমস্যাতেও পড়তে হয় ডেলিভারি কর্মীদের।

গ্রাহকদের অবশ্যই দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়া উচিত। তাদের

অবশ্যই সংশ্লিষ্ট প্ল্যাটফর্মকে আলোর ঘাটতি, লিফট না থাকা বা হিংস্র পোষ্য থাকার ব্যাপারে আগাম জানিয়ে রাখা উচিত। সেই সঙ্গে ডেলিভারির জায়গাটা নিরাপদ না হলে অবশ্যই জরিমানা ছাড়া কর্মীদের প্রত্যাখ্যান করার অধিকারও থাকা উচিত।

প্ল্যাটফর্মের নকশা নিরাপদ ব্যবহারকে মজবুত করতে পারে। রাত দশটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত আসা অর্ডারকে ‘লেট নাইট আর্জেন্সি অ্যাকনলেজমেন্ট’-এর আওতাভুক্ত করে জিনিসটা পৌঁছে দেওয়া জরুরি কি না তা পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে। বাধ্যতামূলকভাবে রাত্রিকালীন শুল্ক বিমা তহবিলকে সাহায্য এবং নিরাপত্তা উপকরণের (রিফ্লেক্টিভ সেফটি গিয়ার) ব্যবস্থা করতে পারে।

গোটা বিশ্বের অভিজ্ঞতা বলছে, নিরাপদ ব্যবস্থা করাটা সম্ভব এবং বাস্তবিক, উভয়ই। নিউ ইয়র্ক শহর ডেলিভারির সংখ্যা নয়, কোন সময়ে কাজ করা হচ্ছে তার নিরিখেই ঘণ্টাপিছু মজুরি ২২.১৩ ডলার ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করেছে। প্ল্যাটফর্মগুলো এই সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করলেও আদালত এই সংস্কারের পক্ষেই রায় দেয়।

ইউরোপীয় ইউনিয়নে প্ল্যাটফর্ম সম্পর্কিত কর্ম-নির্দেশিকা (ওয়ার্ক ডিরেক্টিভ) ২০২৬-এর ডিসেম্বর থেকে প্রযুক্ত হবে। এতে কর্মরত অবস্থায় বিনা বিচার বা প্রমাণে মেনে নেওয়া বিষয় আইনি নির্দেশ (লিগ্যাল প্রিজাম্পশন অব এমপ্লয়মেন্ট) আনা হচ্ছে। যদি কোনো প্ল্যাটফর্ম কর্মীদের উপর তাৎপর্যপূর্ণভাবে কর্তৃত্ব ফলায়, স্বাভাবিকভাবে শ্রম-অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা দেওয়ার দায়ও তাদের উপর চাপে। নির্দেশিকায় অ্যালগরিদম-এর সাহায্যে পরিচালন ব্যবস্থা নিয়েও আলোকপাত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, অ্যাকাউন্ট সাময়িকভাবে (সাসপেনশন) বন্ধ রাখার মতো বিষয়গুলো নিয়ে সিদ্ধান্তের উপর মানুষের নজরদারিও প্রয়োজন।

স্পেনের ‘রাইডার্স ল’ অনুযায়ী ডেলিভারি কর্মীরা স্বাভাবিক নিয়মেই বেতনভুক কর্মচারী (এমপ্লয়) বলে গণ্য হয়, যদি না প্ল্যাটফর্ম অন্য কোনোভাবে প্রমাণ করে। ইংল্যান্ডে উবর বিভি বনাম আসলাম মামলার রায় মোতাবেক, গিগ কর্মীদের কর্মচারী (ওয়ার্কার) শ্রেণীভুক্ত



করা হয়েছে, যাঁদের প্ল্যাটফর্মের নিয়ন্ত্রণের খাপ অনুযায়ী ন্যূনতম বেতন, সবেতন ছুটি এবং অবসরকালীন সুবিধা (পেনসন) দেওয়া হয়। অস্ট্রেলিয়ার ‘ক্লোজিং লুপহোল্‌স নং ২, অ্যাক্ট ২০২৪’ তাদের ফেয়ার ওয়ার্ক কমিশনকে গিগ ওয়ার্কারদের ন্যূনতম মজুরি, বিমা এবং কাজের মান রক্ষার দায়িত্ব দিয়েছে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন বর্তমানে অ্যালগরিদম বিষয়ক স্বচ্ছতা এবং মৌলিক সামাজিক সুরক্ষা বিষয় মাথায় রেখে প্ল্যাটফর্ম ইকনমি যাতে সুন্দরভাবে কাজ করতে পারে, সেই বিষয়ে নতুন মান তৈরির কাজ করছে।

ভারতও এইসব প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দিতে শুরু করেছে। কিছু প্ল্যাটফর্ম বিশ্রাম কেন্দ্রের (রেস্ট পয়েন্ট) কথা ঘোষণা করেছে এবং ব্যবহারকারী তথা গ্রাহকদের প্রচণ্ড গরমের সময় জরুরি নয় এমন জিনিস অর্ডার করা থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করেছে। তামিলনাড়ু চেম্বাইতে গিগ ওয়ার্কারদের নিখরচায় বিশ্রামের জন্য বাতানুকূল বিশ্রাম লাউঞ্জের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রাথমিক ধাপে নেওয়া এই পদক্ষেপগুলো গোটা দেশেই কার্যকর করা উচিত।

আখেরে এটা সম্মান ও মানবিকতার আহ্বান। যে সব কর্মী আমাদের দুয়ারে হাজির হচ্ছেন তাঁরা নামগোত্রহীন পরিষেবাপ্রদানকারী নন, তাঁরা প্রায়শই শিক্ষিত তরুণের দল, যাঁরা পরিবারকে সাহায্য করতে এই পেশায় এসেছেন।

তাঁকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেওয়া, এক গ্লাস জল খাওয়ার প্রস্তাব দেওয়া, নিদেন ধন্যবাদ দেওয়ার মতো সামান্য আচরণও তাঁদের দীর্ঘ সময়ের কাজের বোঝা কিছুটা লাঘব করতে পারে। শিবা, সন্দীপ, হেম শঙ্কর, অক্ষুশ এবং রিজওয়ানরা ছিল তরুণ, যাঁদের স্বপ্ন কাজ করতে করতেই শেষ হয়ে গিয়েছে!

পরের ডেলিভারির উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই গিগ কর্মীরা পথে। আমরা যদি আইন, নীতি এবং ব্যক্তিগত দায়িত্ব অনুযায়ী কাজ করতে না পারি, পরের দুঃখজনক পরিণতি হয়ত সেই পথ ধরেই আসছে! সূত্র: ডেলিভারি অ্যাট এনি কস্ট, দ্য স্টেটসম্যান, ১৫ মে ২০২৬।

ভাষান্তর : সমীরকুমার ঘোষ

উমা

মাছ

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৬

চন্দ্রাভিযানের সেকাল একাল

শামীম হক মন্ডল

অর্ধশতাব্দী পর আবার চাঁদে পাড়ি দিল মানুষ। গত ১ এপ্রিল, চারজন নভোচারীকে নিয়ে আমেরিকার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে রওনা দেয় নাসার মহাকাশ যান। এর আগে, যান্ত্রিক গোলযোগের জন্যে, গত ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে উৎক্ষেপণ সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছিল। ১৯৭২ সালের পর মানুষজন আর চাঁদে যায় নি; ইসরো, নাসা সহ পৃথিবীর বিভিন্ন স্পেস এজেন্সি অনেকবার চন্দ্রাভিযান করলেও কোনো মহাকাশচারীকে আর চাঁদে পাঠানো হয় নি। তবে, এবারও কিন্তু শশীর আঙিনায় পায়ে হেঁটেঘুরে বেড়াবেন না নভোচারীরা; মহাকাশযানে চেপে, চাঁদের চারপাশে ঘুরপাক খাবেন। বিজ্ঞানীদের গণনা অনুসারে, এ সময় চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৭৪০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করবে নাসার মহাকাশযান, ওরিয়ন। চাঁদের মাটিতে পা রাখতে গেলে বিজ্ঞানীদের অপেক্ষা করতে হবে, পরবর্তী মিশন—আর্টেমিস-৩ পর্যন্ত।

চাঁদ দখলের লড়াই আজ নতুন নয়; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে মহাকাশ দখলের ঠাণ্ডা লড়াইয়ে মেতে উঠেছিল তৎকালীন বিশ্বের দুই প্রধান শক্তি—ধনতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক আমেরিকা ও সমাজতন্ত্রের আঁতুড়ঘর সোভিয়েত ইউনিয়ন। আর তখন মহাকাশ অভিযান মানে, কে আগে চাঁদে পৌঁছতে পারে; মহাকাশ দখল, চাঁদে উপনিবেশ গড়া, এ সবার অভিপ্রায় তখন ছিল না বললেই চলে। শুরুর দিকে, রাশিয়া তো বলে বলে গোল দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে; মহাকাশে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ (স্পুটনিক-১) পাঠানো থেকে আরম্ভ করে, লাইকা নামক কুকুরকে পাঠানো, এমনকি প্রথম নভোচারী ইউরি গ্যাগারিন সহ, সবখানেই সমাজতান্ত্রিক দাপট স্পষ্ট। এসবের প্রভাব যে মার্কিন জনগোষ্ঠীর ওপর পড়বে, তা তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও উচ্চপদস্থ কংগ্রেস সদস্যরা আঁচ করতে পেরেছিলেন। আর সেজন্যই কেনেডি সেই সময়ে আসন্ন নির্বাচনে দেশের জনগণকে প্রতিশ্রুতি দেন— ‘মহাকাশ জয়ের লড়াইয়ে এবারে আমরা রশদের হারাবই’। কেনেডি ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ। এই এক চালেই বাজিমাৎ করলেন তিনি। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী, মহাকাশ খাতে ব্যাপক বাজেট বরাদ্দ হল। ফলস্বরূপ, অ্যাপোলো-১১-এর প্রথম চন্দ্রাভিযান সফল হয়। কিন্তু দু’বছর পরই খুন হয়ে যাওয়ার ফলে তিনি দেখে যেতে পারেন নি তাঁরই নামাঙ্কিত কেনেডি স্পেস স্টেশন থেকে আরোহী সমেত উড়ে যাচ্ছে অ্যাপোলো-১১। সেই হল শুরু। তারপর একে একে রাশিয়া, চীন, জাপান চাঁদে মহাকাশযান পাঠানো শুরু করে। ১৯৬৯ থেকে

১৯৭২—এই চার বছরে মোট ছ'বার মার্কিন নভোচারীরা চাঁদে গেছেন; কিন্তু সোভিয়েতরা চাঁদে মানুষ পাঠাতে পারেন নি। তাঁরা কেবল রোবট পাঠিয়েছে নমুনা সংগ্রহের জন্য।

দীর্ঘ দিন পর আবার চাঁদে নামার তোড়জোড় শুরু হয়েছে। নাসার এই অভিযানের নাম—আর্টেমিস মিশন। ২০২২ সালে আর্টেমিস-১ মিশন পরিচালনা করে নাসা, তাতে অবশ্য কোনো মহাকাশচারী ছিল না; শক্তিশালী ‘স্পেস লঞ্চ সিস্টেম’ (SLS) রকেটে চড়ে চাঁদের কক্ষপথ পরিভ্রমণ করে পৃথিবীতে ফেরত আসে নাসার মহাকাশযান—‘ওরিয়ন’। মূলত, গতিপথ চেনা আর পরবর্তী মিশনের প্রস্তুতি নেওয়াই ছিল উদ্দেশ্য।

এবারের দশ দিনের আর্টেমিস মিশন-২-এর মূল লক্ষ্য হল চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে স্থায়ী ঘাঁটি গাড়ার ভিত্তি স্থাপন করা। সেই উদ্দেশ্যেই এইবার মহাকাশে পাড়ি জমাবেন চার মহাকাশচারী — রিড উইজম্যান, ভিক্টর গ্লোভার, ক্রিস্টিনা হ্যামক কথ এবং কানাডার জেরেমি হ্যানসেন। এঁদের মধ্যে ক্রিস্টিনা হলেন প্রথম মহিলা মহাকাশচারী, যিনি চাঁদে যাচ্ছেন।

চাঁদের দক্ষিণ মেরু নিয়ে বিভিন্ন সংস্থা কেন এক উদগ্রীব?

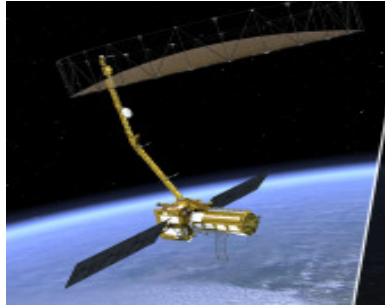
চাঁদের উত্তর মেরুর তুলনায়, দক্ষিণ মেরুতে কম সংখ্যক অভিযান চালানো হয়েছে এতদিন। সেজন্য এটি অনেকটাই অজানা, অনাবিস্কৃত— বিজ্ঞানীরা একে বলেন ‘ডার্ক সাইড অফ দ্য মুন’। ২০২৩ সালের ২৩ আগস্ট সেখানেই সফলভাবে অবতরণ করে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর বিক্রম এবং সগৌরবে হেঁটে বেড়িয়েছে রোভার, প্রজ্ঞান। এই দক্ষিণ মেরুতে বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন জলের সন্ধান। সেই জলের বিভাজন থেকে হাইড্রোজেন নিষ্কাশন করতে পারলে তা দিয়ে বানানো যাবে রকেটের জ্বালানি।

শুধু তাই নয়, এখানে রয়েছে দুষ্প্রাপ্য খনিজ সম্পদের প্রাচুর্যের সম্ভাবনা। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন চাঁদের পৃষ্ঠদেশের অনেক গভীরে পাওয়া যেতে পারে ম্যাগনেশিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, টাইটেনিয়াম, সিলিকন প্রভৃতি খনিজ। এমন কি মিলতে পারে ক্যালসিয়াম, পটাশিয়ামের মতো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। সম্ভাবনা রয়েছে হিলিয়ামের এক দুষ্প্রাপ্য আইসোটোপ, হিলিয়াম-৩ (He^3)-র সন্ধান মেলায়, পৃথিবীতে যা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এই হিলিয়াম-৩ (He^3),

থার্মো নিউক্লিয়ার ফিউশন রিঅ্যাক্টরের মূল উপাদান, যেখান থেকে আমরা পেতে পারি মানুষের ব্যবহার উপযোগী বিপুল নিউক্লিয়ার শক্তি (মাত্র ২ টন হিলিয়ামের এই আইসোটোপ থেকে ভারতের মতো দেশে সারা বছরের শক্তি যোগান দেওয়া সম্ভব)।

শুধু খনিজ পদার্থই নয়, এখানে উপনিবেশ পড়তে পারলে, স্পেস স্টেশন হিসেবে চাঁদকে ব্যবহার করা যাবে। সেখান থেকে দূর মঙ্গলে পাঠানো যাবে মহাকাশযান। এখানে পাওয়া শক্তি, রেডিয়েশনের মাধ্যমে পাঠানো যাবে স্যাটেলাইটে।

গ্রীক পুরাণ অনুযায়ী, অ্যাপোল ও আর্টেমিস ছিলেন যমজ ভাইবোন; প্রথমজন সূর্যের দেবতা, আর বোন ছিলেন চাঁদের দেবী। সেই থেকেই এই মিশনের নামকরণ হয়েছে নাসা। কেবলমাত্র একটি রকেট উৎক্ষেপণ নয় বা চাঁদের চারপাশে পরীক্ষামূলক ভ্রমণ নয়, এই মিশন সফল হলে ২০২৭ সালের প্রস্তাবিত আর্টেমিস-৩-এর যাত্রা সুগম হবে। সেই সঙ্গে চন্দ্র জয়ের দিকে আরো একধাপ এগিয়ে যাবে পরবর্তী প্রজন্মের মহাকাশ বিজ্ঞানীরা।



ঋণস্বীকার :

১। <https://www.jfklibrary.org/learn/about-jfj/fk-in-history/campaign-of-1960> ২। <https://www.nasa.gov/mission/artemisii> ৩। <https://www.isro.gov.in/Chandrayan2.html> **উ মা**

সংশোধনী

এপ্রিল-জুন ২০২৬ সংখ্যায় ২৮ পৃষ্ঠায় গৌতম মিস্ত্রীর লেখায় শেষ অংশটুকু বাদ যাওয়ায় আমরা আন্তরিক দুঃখিত। সেই অংশটুকু আমরা এখানে দিলাম।

গ্লুকাগন লাইক পেপটাইড রিসেপ্টর-১ অ্যানালগ ব্যবহারের বড় বাধা আলাদা। এগুলোর ব্যবহারে মানসিক অবসাদ, কর্মক্ষেত্রে উদ্যমের অভাব, চর্বির সঙ্গে মাংসপেশি কমে যাওয়া। এই সমস্যা ব্যবসায়ীদের কাছে আর একটা ব্যবসার দরজা খুলে দিয়েছে— প্যাকেটবন্দি প্রোটিন পণ্য, ডায়াটেশিয়ান আর জিমনাসিয়ামের ব্যায়াম প্রশিক্ষকের নতুন বাজার আপনার দোরগোড়ায় হাজির। গ্লুকাগন লাইক পেপটাইড রিসেপ্টর-১ খেলে আপনাকে এগুলোও কিনতে হবে।

সন্ন্যাসী বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

শ্যামল ভদ্র

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ১৬৫তম জন্মবর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য।

(০২.০৪.১৮৬১ — ১৯.০৬.১৯৪৪)

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বাঙালির অবদানের কথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমে দেশের স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা জনমানসে বিস্তারলাভ করতে থাকে, কারণ ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসক সাধারণ মানুষকে ক্রমাগত অত্যাচার ও শোষণে জর্জরিত করে তোলে। সেই সময়ে উচ্চবিত্ত ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন। মহারাষ্ট্রের গোপাল কৃষ্ণ গোখল সারাজীবন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে ও সমাজসংস্কারের জন্যে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন। এই আন্দোলনের সূত্রেই তিনি অনেক বাঙালি রাজনৈতিক নেতা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত বাঙালিদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম বিজ্ঞান সাধক ও সমাজসংস্কারক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। মহামতি গোখল তাঁকে ‘বৈজ্ঞানিক সন্ন্যাসী’ বলে সম্বোধন করতেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর “আত্মচরিত” গ্রন্থে গোখল সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছেন। উল্লেখ করেছেন যে গোখল তাঁকে মহাত্মা গান্ধীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁদের বিশেষ চারিত্রিক সাদৃশ্যের কারণে অচিরেই দুজনের সখ্যতা গড়ে ওঠে, এবং গান্ধীজীর কাছে জানতে পারেন দক্ষিণ আফ্রিকায় ঔপনিবেশিক শাসনের বর্বরতার বিবরণ। দুজনেরই ছিল ত্যাগ ও তিতিষ্কার প্রতি আন্তরিক নিষ্ঠা। ১৯০১ সালে মূলত আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের উদ্যোগে এবং মহামতি গোখলের সহায়তায় কলকাতার অ্যালবার্ট হলে (অধুনা কলেজ স্ট্রিট কফি হাউস) এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়, সভার মূল বক্তা ছিলেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। সভায় অনেক জনসমাগম হওয়ার ফলে গান্ধীজি কলকাতায় বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন। কলকাতায় এলে গান্ধীজি কখনোই প্রফুল্লচন্দ্রের সাথে দেখা না করে যেতেন না। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, সেই সময়ে বিজ্ঞানীদের অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাগারের বাইরে স্বাধীনতা আন্দোলনে ও দেশের মঙ্গলের জন্যে যে কোনো

২০

কাজে যুক্ত হতেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য এবং এক ব্যতিক্রমী চরিত্র। তাঁর সততা, সরল এবং সন্ন্যাসীর মতো জীবন যাপন সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষকেই আকৃষ্ট করত।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার সাথে রসায়ন বিজ্ঞানে নিবিড় গবেষণায় ব্যস্ত থাকতেন, ফলস্বরূপ পৃথিবীর বিজ্ঞানী মহলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। রসায়ন বিজ্ঞানে নানা উদ্ভাবন তাঁকে পৃথিবীজোড়া খ্যাতি এনে দেয়। উল্লেখ করার বিষয় এই যে, অধ্যাপনা ও নিরলস গবেষণার বাইরে প্রফুল্লচন্দ্র সামাজিক নানা কর্মকাণ্ডে নিজেকে যুক্ত করে নিয়েছিলেন। পরাধীনতার শ্রানি তাঁকে ভীষণভাবে ব্যথিত করত। বাংলার গ্রামের দুরবস্থা ও সামাজিক বৈষম্য তাঁকে অত্যন্ত গীড়া দিত, তাই সদা সচেতন ছিলেন গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে। তাঁর জন্ম বাংলাদেশের খুলনা জেলার কপোতাক্ষ নদীর তীরে রাডুলি গ্রামে এক বর্ধিষুং জমিদার পরিবারে। পিতা হরিশচন্দ্র রায় রামতনু লাহিড়ীর ছাত্র ছিলেন এবং বিদ্যাসাগরের অনুগামী ছিলেন, মাতা ভুবনমোহিনী দেবী বিদ্যাসাগরের কাছে ভাষাশিক্ষার পাঠ নিয়েছিলেন এবং শিক্ষিত ব্রিটিশ মহিলারা তাঁকে লেখাপড়ার সাথে সূচিশিল্পের কাজ শেখাতেন, যা তখনকার দিনে এক অসম্ভব ব্যাপার ছিল। এরকমই এক পারিবারিক পরিমণ্ডলে অত্যন্ত মেধাবী প্রফুল্লচন্দ্রের বড় হয়ে ওঠা।

বিলেতের এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নে উচ্চতর ডিগ্রি এবং বিশেষ কৃতিত্বের সাথে গবেষণা শেষ করার পর প্রফুল্লচন্দ্র ডি এস সি ডিগ্রি লাভ করেন এবং দেশে ফিরে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র গবেষকদের মধ্যে রচনা প্রতিযোগিতায় তিনি ইন্ডিয়া বিফোর অ্যান্ড আফটার দ্য মিউটিনি প্রবন্ধটি লিখে ছাত্র ও শিক্ষক মহলে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেন। তখনই ইতিহাস,

১৯ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৬

দর্শন ও অর্থনীতি বিষয়ে তাঁর গভীর অনুসন্ধিৎসু মনের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্রদের মধ্যে যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ, দেবেন্দ্র মোহন বোস, নীলরতন ধর প্রমুখ। জগদীশচন্দ্র বসুও তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা ও গবেষণার কাজে যুক্ত। জগদীশচন্দ্র বসুর পরিবারের সাথে প্রফুল্লচন্দ্র অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। লেডি অবলা বসুকে তাঁর অনেক আবদার মেটাতে হত। রবীন্দ্রনাথ ও প্রফুল্লচন্দ্রের জন্ম একই বছরে কয়েকমাসের ব্যবধানে, ১৮৬১ সালে আগস্ট মাসের ২ তারিখে। ১৯১৬ সালে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজে রসায়নের পালিত অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেছিলেন। তারপরেই সি ভি রমন পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে পালিত অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন, অন্যদিকে ভারতীয় উপমহাদেশে আধুনিক বিজ্ঞানের জনক জগদীশচন্দ্র বসু ১৯১৭ সালে রাজাবাজার সায়েন্স কলেজের পাশে বোস ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর ষাটতম জন্মদিনে এটিকে জাতীয় সেবায় উৎসর্গ করেন। রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র বসুর চিঠিপত্র থেকে জানা যায় যে, শিক্ষা ও সামাজিক সমস্যা সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আচার্য ভবনে (বোস ইনস্টিটিউট) মিলিত হতেন। সময়টা আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উন্মেষে, সে এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত।

প্রফুল্লচন্দ্রের সপ্ততিতম জন্মোৎসব পালিত হয় ১১ ডিসেম্বর, ১৯৩২ সালে কলকাতার টাউন হলে। ডা. নীলরতন সরকার জন্মোৎসব কমিটির সভাপতি ছিলেন। মূল অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন — “আমরা দুজনে সহযাত্রী। কালের তরীতে আমরা একঘাটে এসে পৌঁছেছি। কর্মের ব্রতেও বিধাতা আমাদের কিছু মিল ঘটিয়েছেন। আমি প্রফুল্লচন্দ্রকে তাঁর সেই আসনে অভিবাদন জানাই, যে আসনে প্রতিষ্ঠিত থেকে তিনি তাঁর ছাত্রের চিত্তকে উদ্বোধিত করেছেন, কেবলমাত্র জ্ঞান দেন নি নিজেকে দিয়েছেন, যে দানের প্রভাবে নিজেকেই পেয়েছে। ...আচার্য নিজের জয়কীর্তি স্থাপন করেছেন উদ্যমশীল জীবনের ক্ষেত্রে—পাথর দিয়ে নয়, প্রেম দিয়ে। আমরাও তাঁর জয়ধ্বনি করি।” এক মহাপুরুষের কি অসাধারণ অভিব্যক্তি তাঁর সহযাত্রী মনীষী সম্পর্কে, যা বর্তমান প্রজন্মের অবশ্যই জানা জরুরি।

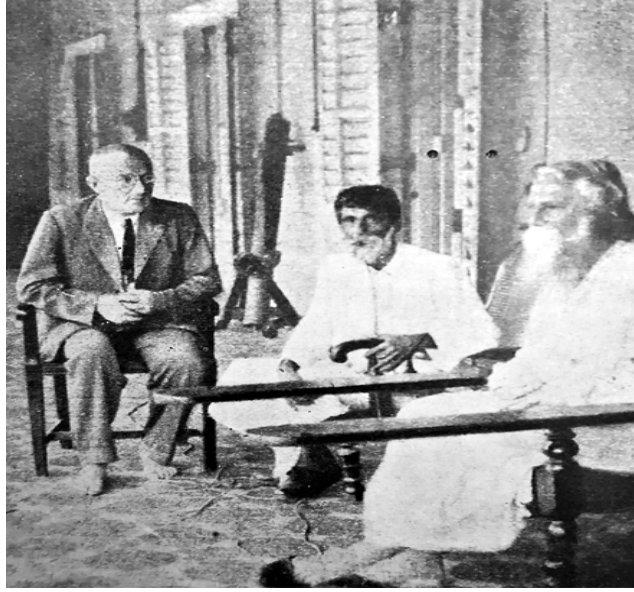
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছতে পেরেছিলেন, প্রসঙ্গত বলা যায় যে, তাঁর সপ্ততিতম জয়ন্তী উৎসবের জন্যে চাঁদা উঠেছিল প্রায় সতেরো হাজার টাকা। অথচ খরচ হয়েছিল মাত্র একশ সাতচল্লিশ টাকা। কারণ চিঠির কাগজ, পোস্টার প্রভৃতির জন্যে কাগজ বিক্রেতারা কোনো অর্থ নেন নি, শুধু তাই নয়, মিউনিসিপাল মার্কেটের ফুল বিক্রেতারা ফুল ও মালার জন্যে কোনো দাম নেন নি। কমিটির সদস্যরা নিজেদের পয়সায় যাতায়াতের খরচ মিটিয়েছিলেন। সম্বর্ধনার উত্তরে অভিভূত প্রফুল্লচন্দ্র বলেছিলেন, এই সংগৃহীত অর্থ যেন ছাত্রদের কল্যাণে ব্যবহার করা হয়। এরকম ঘটনা সত্যিই বিরল। তাঁর সন্ন্যাসীর মতো জীবন যাপন এবং দেশের জন্যে সমর্পিত প্রাণ তাঁকে সমাজের উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

বিজ্ঞানচর্চার বাইরে ইংরেজি সাহিত্যে বিশেষ করে শেক্সপীয়ারের নাটকে তাঁর অসামান্য ব্যুৎপত্তি সবাইকে মুগ্ধ করত। শেক্সপীয়ারের নাটকের ওপর তাঁর গবেষণামূলক রচনাগুলি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের *The Calcutta Review* জার্নালে নভেম্বর ১৯৩৯ থেকে এপ্রিল ১৯৪১ পর্যন্ত সংখ্যাগুলিতে প্রকাশিত হয়েছিল। যতদূর মনে হয়, রচনাগুলি ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র ও গবেষকদের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র বিখ্যাত সংগীতশিল্পী দিলীপকুমার রায়ের ‘স্মৃতিচারণ’ গ্রন্থ থেকে — দিলীপকুমার রায় প্রেসিডেন্সি কলেজে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ছাত্র ছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র বলেছিলেন—“আমি কতবার যে পড়ি ওঁর (শেক্সপীয়ার) নাটক দিলীপ, আর বলি শেক্সপীয়ার শেলফে মজুত থাকলে আর বই না থাকলেও চলে।” দিলীপকুমার রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজে ওঁর বাসস্থানে যেতেন গান শোনাতে; একবার সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন প্রফুল্লচন্দ্রের কাছে। শরৎচন্দ্রকে দেখে উনি ভীষণ খুশি কারণ শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের ভক্ত ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র, বিশেষ করে ‘পল্লীসমাজ’, তা অকুণ্ঠচিত্তে প্রকাশ করেছিলেন। ফিরবার পথে শরৎচন্দ্র দিলীপ রায়কে বলেন যে, না দেখলে বিশ্বাস হয় না—যেন ষাট বছরের শিশু। জ্ঞান-নিষ্ঠা-সারল্যের যেন এক প্রতিমূর্তি। দিলীপ রায় আরও লিখেছেন—“আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন শুধু শিক্ষকের, আচার্যের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নয়—সব জড়িয়ে তিনি এমন একটি আশ্চর্য আদর্শবাদীরূপে ফুটেছিলেন, ...তাই তো তিনি

তঁার জীবদ্দশায়ই সমগ্র ভারতে একটি বরেণ্য মনীষী, প্রেমিক দানবীর তথা সংসারী সন্ন্যাসী বলে গণ্য হয়েছিলেন।”

শেষে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে হয়—যে কোনো সামাজিক সংকটে প্রফুল্লচন্দ্র নিঃশঙ্কচিত্তে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। ১৯২২ সালে প্রবল বর্ষণে পূর্ববঙ্গে বর্তমানে বাংলাদেশের বেশ কিছু জেলা আশ্রয়ী নদীর ভয়ংকর বন্যায়

ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার দুর্গতদের সাহায্যার্থে কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করে নি, যা প্রফুল্লচন্দ্রকে ভীষণভাবে ব্যথিত করে। কিন্তু চুপ করে বসে থাকার মানুষ তিনি নন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের নেতৃত্বে তৈরি হয় বন্যা ত্রাণ কমিটি, তাতে সামিল হয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু, মেঘনাদ সাহার মতো মানুষজন। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষজন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন শুধুমাত্র প্রফুল্লচন্দ্রের নেতৃত্বের দিকে তাকিয়ে। এ



কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও একজন বিদেশী অতিথি রাজবাজার সায়েন্স কলেজে প্রফুল্লচন্দ্রের বাসস্থানে, ১৯৩৭। রবীন্দ্রনাথ যে চেয়ারটিতে বসে আছেন, এখনও সেটি সায়েন্স কলেজের দোতলায় প্রফুল্লচন্দ্র মিউজিয়াম-এ দেখতে পাওয়া যাবে। (photo collected from Birth Centenary souvenir)

তাহাতে আপত্তি করে নাই। রাজনৈতিক প্যাক্ট ও আপোষ সফল হইতে না পারে, কিন্তু এই আন্তরিক সেবা ও সহানুভূতির দৃঢ় ভিত্তির উপর যে বন্ধুত্ব গড়িয়া উঠে, তাহার ক্ষয় নাই। এই বন্যার মধ্য দিয়া আমরা ভবিষ্যৎ যুক্ত ভারতের স্বপ্ন দেখিয়াছি।” এই ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, যাঁর অন্তরে নিরন্ন ও নিপীড়িত মানুষের হাহাকার, তাঁরা যে

সম্প্রদায়েরই হোক না কেন, প্রতিনিয়ত তাঁকে ক্ষত-বিক্ষত করতো। পরাধীন ভারতে এই আচার্য সন্ন্যাসী বিজ্ঞানীর মহাপ্রয়াণ ঘটে ১৬ জুন ১৯৪৪ সালে। তাঁর মৃত্যুর পর একমাত্র সম্মল বলতে ছিল দুটি আলমারি। খোলার পর দেখা গেল শেলফ ভর্তি শুধুই শেক্সপীয়ারের বই এবং এই সংক্ৰান্ত বেশ কিছু বই। কোনো এক সভায় বলেছিলেন যে সাহিত্য সাধনাই ছিল তাঁর প্রথম পছন্দের।

বিষয়ে প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর ‘আত্মচরিত’ গ্রন্থে বিশদে আলোচনা করেছেন। লেখাটির একটি অংশ বিশেষভাবে উল্লেখ করব যা আমাদের সমাজে এখনও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক— “বন্যা সম্বন্ধে একটা খুব বড় কথা এই যে, হিন্দু-মুসলমান মিলনের সমস্যা এই বন্যা সেবাকার্যের মধ্যে দিয়ে আশাপ্রদ বলিয়া মনে হয়। যাঁহারা এই মিলন সম্ভবপর মনে করেন না, তাঁহাদিগকে আমি জানাইতে চাই যে, বন্যাপীড়িতদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৮০ জনই ছিল মুসলমান এবং যাঁহারা সাহায্য কার্য করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৯৯ জনই ছিল হিন্দু এবং আমি নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি যে, কোনো হিন্দুই মুসলমান ভ্রাতাদের সাহায্যের জন্যে যে সময় ও শক্তি ব্যয়িত হইয়াছে,

কেহ নাহি জানে কার আত্মানে কত মানুষের ধারা
দুর্বীর স্রোতে এল কোথা হতে, সমুদ্রে হল হারা।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য। হেথায় দ্রাবিড়, চীন
শক-ছন-দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উমা

সব লোকে কয় লালন কি জাত

দীপাবলি সেন

বছর তিনেকের মেয়ে আমার, নাম রুম্পা সেন, আমার নিকটতম প্রতিবেশীর সাত বছরের ছেলে বান্টির সঙ্গে খেলা করছিল। রোজই করে। খুব ভাব ওদের। প্রতিবেশী অলক চ্যাটার্জি আই টি সেক্টরের কর্মী। ওদের বাড়ির সামনে একটা ‘লন’ আছে আর তার ওধার দিয়ে পথ চলে গেছে। আমার আর একজন প্রতিবেশী, কেমিস্ট্রির অধ্যাপক, রোজ সে পথ দিয়ে কলেজে যান। উনি আমার সঙ্গে দু-একটি কথা বলে যান। আজ আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, হাসিমুখে মন্তব্য করে গেলেন, ‘কি, মেয়ে তো দেখছি বামুনের ছেলের জাত মেরে দেবে!’

আমি চমকে উঠে কিছু বলতেই পারলাম না। আজকের দিনে এ ধরনের কথা? এ তো তিমিরাচ্ছন্ন মধ্যযুগ নয়। গ্রামীণ পল্লীসমাজ নয়।

যদিও ভেবে দেখলাম, জাতজন্ম এবং জাতজন্ম-খোয়ানো আমাদের বহু পরিচিত ব্যাপার। সেই কবে থেকে শুরু হয়েছিল কেউ জানে না। ঋগ্বেদেও এর উল্লেখ পাওয়া যায়, আর ত্রেতা যুগ আসতে আসতে এটি তো দিব্যি চালু হয়ে গিয়েছিল। কোনো আপত্তি ওঠে নি, দ্বাপরযুগে কৃষ্ণ গর্ব সহকারে অর্জুনকে বলেছিলেন, আমি-ই প্রধান। আমি-ই সনাতন। এমনকি চাতুর্বর্ণ প্রথাটাও আমারই সৃষ্ট। জৈন ও বৌদ্ধরা মাথা তোলার আগে কেউ জাতিভেদ প্রথার কোনোরকম প্রতিবাদ করেছেন বলে জানি না। তথাকথিত হিন্দুরাষ্ট্রে জাতিভেদ প্রথা তো থাকবেই।

ইসলামীয় ও খ্রীস্ট ধর্মীয়রা ভারতবাসীকে প্রথম দেখালেন, ভিক্ষু বা সন্ন্যাসী না হয়েও, মানুষ জাতিভেদ ব্যাপারটা ছাড়াই সংসারে দিব্যি বেঁচে থাকতে পারে। এমনকি ধীরে ধীরে হিন্দুরাজ্যটিকে নিজেদের কজায় নিয়ে আসতে পারে। পঞ্চদশের তীরে শিখ জেগে উঠল। গুরু গোবিন্দ বললেন, মানস জাত সব-হে এক হি পহচান ব। চিনে নাও, সব মানুষের জাত এক।

জনগণনা শুরু করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আঞ্চলিকভাবে এলাহাবাদ, বেনারস, ঢাকা এবং মাদ্রাজে। ব্রিটিশ শাসন কায়ম হয়ে যাবার পরে ১৮৮১ থেকে এটি নিয়মিত হয়ে

যায়। অর্থাৎ সেন্সাস বা জনগণনা একেবারেই ব্রিটিশ অবদান। (তারও আগে গিয়ে বলা যায়, এটি একটি জবরদস্ত রোমান প্রথা, যা মানতে পূর্ণগর্ভবতী মেরিকে বেথলহেম অবধি যেতে হয়েছিল।)

১৯৩১-এর সেন্সাস-এ জাতিগত তথ্যাদি সম্পূর্ণ ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সংগৃহীত ও প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯০০-এর ওপর জাত সেটিতে উল্লিখিত ছিল। ১৯৩১-এর পরে ‘জাতের হিসেব’ ভারতীয় জনগণনায় আর ছিল না, স্বাধীন ভারতে ১৯৫১ থেকে এই হিসাবটি করা হয় নি, ‘এস সি এস টি’ ছাড়া।

আমাদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কিছুটা সাম্যবাদী ছিলেন, রাষ্ট্রপিতা বলতেন, ‘অল মেন্ আর ব্রাদার্স’, সব মানুষই ভাই-ভাই ...বিভিন্ন কারণে এই নিয়ে তখন কোনো তুমুল আলোড়ন হয়েছিল বলে তো জানি না...এস.সি। প্রধানত রিজার্ভেশন বা আরক্ষণের উদ্দেশ্যে, এস সি এস টি-র সমস্যা থেকেই গিয়েছিল ও বেড়েই যাচ্ছিল।

চিন্তাধারার যথার্থ পরিবর্তন ঘটছিল। চিন্তানায়ক অশোক রুদ্র তাঁর শেষজীবনে বলতেন, ও যতই লোকে আধুনিক হাবভাব করুক, একটু চুলকালেই চামড়ার তলায় পুরনো সংস্কার বেরিয়ে পড়ে। নিজের জীবনেও দেখেছি, বংশ-পুনর মতো জায়গায়ও মহিলারা ঘরে এলে তেল-সিঁদুর দিয়ে অভ্যর্থনা করার সময় একবার জিজ্ঞাসা করে নেন, তুমি কি জাত? মারাঠী ভাষায় আপনি-তুমি তেমন নেই। সবাই তুমি। সবাই সমান। কিন্তু জাতের ব্যাপারে তাঁদের সাম্যভাব তেমন দেখি নি। চিৎপাবন ব্রাহ্মণ বিশেষ সম্মানের অধিকারী হয়ে থাকেন আজও। তাঁরা নীলনয়ন। ব্লু-বাডেড বললেও হয়।

আরও দুঃখের কথা, আজকাল শিখদের মধ্যেও পদবী উল্লেখ করার প্রবণতা দেখা দিচ্ছে। তাঁরা এক একজন ‘সিংহ’ এটাই যেন যথেষ্ট নয়। শেষে সেই উল্লেখ করতে হচ্ছে বংশ পরিচয়। ভূপিন্দর সিং ফুল, কিংবা পরমজিৎ সিং মান।

সেই অ্যান্টনি কবিরালের থেকে এই শতাব্দী অবধি কত অকালমৃত্যু হয়ে গেল এই কলকাতার কাছেই, কোনো দূর

অন্ধকারাচ্ছন্ন এলাকায় নয়। ‘অনর কিলিং’ হয়ে উঠল আটপৌরে ঘটনা ভারতের নানা প্রদেশে।

একাদশতম পরিকল্পনার শেষ দিকে ২০১১-র একটি সোশিও ইকনমিক অ্যান্ড কাস্ট সেন্সাস করা হল, যদিও জনসাধারণের জন্য সেটি প্রকাশ করা হয় নি। ইতিমধ্যে আরক্ষণের দাবি ক্রমশ জোরদার হয়েছে। তার মূল উদ্দেশ্য ভুলে সেটার দুরূপযোগ চলছে, কয়েমি স্বার্থের খাতিরে। তবু সেটা ঠিক আইন বা বন্দোবস্তী হয়ে যায় নি।

বিহার সরকার ২০২৩-এর শেষদিকে একটি কাস্ট সার্ভে করলেন। কর্ণাটক ও তেলেঙ্গানা অনুসরণ করল বেশ বড় মাপে। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টও এবার এগিয়ে এলেন। মাত্র কয়েকটি রাজ্যে জাতিভিত্তিক জনগণনা হয়ে যাবার পরে সাধারণভাবে রাষ্ট্রীয় স্তরে এটি ইউনিয়ন ক্যাবিনেটের সমর্থন পেয়ে গেল। ২০২৭ থেকে জনগণনা জাতিগত পুঙ্খানুপুঙ্খ সম্বলিত হবে। লেখাপড়া হয়ে থাকবে। অকাটা। অমোঘ। কোনও শূদ্র শম্বুক আর স্বর্গে যাবার স্বপ্ন দেখতে পারবে না। আধার কার্ডেও ঢুকে যাবে ঐ তথ্য।

লালন কি জাত, সংসারে আর তা কারো শুধোতে হবে না। এটি হল ‘এ রেট্রোগ্রেড স্টেপ ইন হিস্ট্রি’ বা ইতিহাসের পশ্চাদপদক্ষেপ।

হতে পারে ব্রিটিশ রুলের মাধ্যমে জনগণনা এসেছিল, কিন্তু সে এসেছিল একটি আধুনিকীকরণ রূপে। ১৯৫১-র পরে সে এনেছিল সাম্যের সম্ভাবনা। তার মধ্যে জাতিগত বিভাজন ঢুকিয়ে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অতিপ্রাচীন যুগে।

রামরাজ্য এলে শম্বুকবধ আসবেই আর জনমানসে ঘটবে সংস্কারমুক্ত চিন্তার ও সাম্যমূলক কার্যের সলিল সমাধি। হবে সার্বজনীন বুদ্ধি-বিলোপ ও গণ-আত্মহত্যা, যেমন হয়েছিল রামায়ণের অন্তে।

উমা

পরিবেশের আতসকাঁচে ডেটা সেন্টার সিদ্ধার্থ সেন

ইদানিংকালে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে এক নতুন অবতার সৃষ্টি হয়েছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। চলতি ভাষায় একে বলে এ আই। চ্যাটজিপিটি, জেমিনি—এই সমস্ত অ্যাপ দিয়ে এখন একরকম অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়। কোনো ব্যাপারে কিছু জানতে গেলে চ্যাটজিপিটিকে প্রশ্ন করলেই হয়, সে উত্তর দেবেই। এ আই দিয়ে যে কোনো ভাষা থেকে যে কোনো ভাষায় লেখা অনুবাদ করা যায়। কোনো দরখাস্ত বা আইনি দলিল তৈরি করতে চাইলে তাকে বিষয়বস্তু বলে দিলেই হবে, সে একটা খসড়া করে দেবে। এমনকি ছাত্রকে দেওয়া হোমটাস্কও এখন এরা অনায়াসেই করে দিতে পারে। মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ বা ডেস্কটপের ছোট্ট একটা অ্যাপ দিয়েই এসব করা যায়। অবশ্য এই যন্ত্রগুলিতে এত জটিল হিসেবনিকেশ ও অঙ্ক করা সম্ভব না। তাই ইন্টারনেটের মাধ্যমে সমস্ত ডেটা পাঠিয়ে দেওয়া হয় একটা সার্ভারে। সেখানে সব কিছু হিসেবনিকেশ করে উত্তরটা আবার খুব দ্রুত ফিরে আসে। এ ছাড়াও ইদানিং আমাদের তথ্যভাণ্ডার এত বিস্তার লাভ করেছে যে সমস্ত কিছু সাধারণ কম্পিউটারের মগজে ধরে রাখা যায় না। সেগুলোও সার্ভারে ধরে রাখা হয়। একটা সার্ভারেও সব কিছু তথ্য ধরে রাখা না গেলে সেগুলি ভেঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় বেশ কয়েকটি সার্ভারে ভাগ করে রাখা হয়। সার্ভারগুলি আবার একেকটি আরেকটির সাথে ফাইবার অপটিক কেবল দিয়ে সংযুক্ত। এই ব্যবস্থাকে বলা হয় ক্লাউড স্টোরেজ। আবার কিছু কিছু জটিল সমাধান একটা সার্ভারের পক্ষেও করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকা কয়েকটা সার্ভার মিলে সেই কাজটি করে। একে বলা হয় ক্লাউড কম্পিউটিং।

বলা বাহুল্য, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এত বাড়বাড়ন্ত হয়েছে ইদানিংকালে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নতির ফলে। এই সার্ভারের কম্পিউটারগুলি অনেক বেশি তথ্য অনেক কম সময়ে বিশ্লেষণ করতে পারে, সেই সাথে ডেটাও দ্রুত লেনদেন করতে পারে। আজকাল আবার অনেকগুলো সার্ভার একসাথে মিলে তৈরি হচ্ছে এক একটা ডেটা সেন্টার। সারা পৃথিবীজুড়েই তৈরি হচ্ছে বিরাট বিরাট ডেটা সেন্টার। অনেকখানি এলাকা জুড়ে এগুলির অবস্থান হতে পারে। এক একটা বড় ডেটা সেন্টার প্রায় কয়েকশো একর জায়গা নিয়ে হতে পারে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ নানা এলাকায় ছড়িয়ে যাওয়ায় ইদানিং বিভিন্ন কোম্পানির মধ্যে নতুন নতুন ডেটা সেন্টার তৈরি করার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় তৈরি হচ্ছে ছোট বড় নানা সাইজের ডেটা সেন্টার। ভারতবর্ষও এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। মুম্বাই, চেন্নাই, পুনে, হায়দ্রাবাদ, নয়ডা, বেঙ্গালুরু, কলকাতা—সমস্ত জায়গা জুড়েই তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন ডেটা সেন্টার। ২০২৬ সালের বাজেটে নতুন তৈরি হওয়া ডেটা সেন্টারগুলিকে ২০৪৭

সাল অবধি ট্যাক্স ছাড় দেওয়া হয়েছে। ভারতবর্ষে ডেটা সেন্টারের বিস্তার কিভাবে হচ্ছে তা একটি পরিসংখ্যান থেকেই বোঝা যাবে। ২০২০ সালে এদের চালাতে বিদ্যুৎ লাগত ৩৭৫ মেগাওয়াট, ২০২৫ সালে তা ছিল মোটামুটি ১৫০০ মেগাওয়াট, আর অনুমান করা হয় ২০৩০ সালে তা গিয়ে দাঁড়াবে প্রায় ৮০০০ মেগাওয়াট। বিদেশে একেকটা বড় ডেটা সেন্টার ৫০ মেগাওয়াট পর্যন্ত হতে পারে।

একটা জিনিস নিশ্চয়ই বুদ্ধিমান পাঠক নজর করেছেন, কম্পিউটারের সাইজ বোঝাতে গিয়ে আগে মেগাবাইট, গিগাবাইট বা টেরাবাইট ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার হত, কিন্তু ডেটা সেন্টারের ক্ষেত্রে বিশালত্ব বোঝানো হচ্ছে মেগাওয়াটে। সেগুলি চালাতে কত বিদ্যুৎ লাগে তার হিসেবে। অর্থাৎ এগুলি কতখানি ডেটা নিয়ে কাজ করতে পারে, তা আর মেগাবাইটের হিসেবে প্রকাশ করা যায় না। সেগুলি চালাতে কত বিদ্যুৎ লাগে তার হিসেবেই এর বিরাটত্ব প্রকাশ করা হয়। বলা বাহুল্য, এগুলি চালাতে যতখানি বিদ্যুৎশক্তি ব্যয় হয় তার বেশিরভাগটাই তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যন্ত্রপাতিকে গরম করে দেয়। এটা অপ্রত্যাশিত নয়; আমাদের মোবাইলও মাঝেমাঝেই গরম হয়ে যায়। মানুষের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করতে যত ক্যালরি শক্তি ব্যয় হয় তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি, মোটামুটি ২০ শতাংশ ব্যয় হয় মস্তিষ্কে; যার ওজন মানুষের শরীরের মাত্র ২ শতাংশ। অর্থাৎ ব্যায়ামবীরেরা যাই বলুক, মানুষের মাথা খাটাতে গিয়েই সবচেয়ে বেশি শক্তি খরচ হয়। কাজেই বেশি ভাবতে গিয়ে যদি কারোর মাথা গরম হয়ে যায়, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এ আই দিয়ে ৫ সেকেন্ডের ভিডিও বানাতে গেলে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ খরচ হয় তাতে একটি মাইক্রোওয়েভ ওভেন আধঘণ্টা চালানো যায়।

ফিরে আসি ডেটা সেন্টারের কথায়। বিরাট সাইজের এক একটা ডেটা সেন্টার, তাকে চালাতে বিদ্যুতই লাগে কয়েক মেগাওয়াট। তা থেকে কতখানি তাপ উৎপন্ন হয়, তা সহজেই অনুমেয়। এই উত্তাপ আবার কম্পিউটার ও নানা জটিল যন্ত্রপাতিকে খারাপ করে দিতে পারে, কাজেই তাদের ঠাণ্ডা রাখা খুবই জরুরি। এর সবচেয়ে সোজা সমাধান হতে পারত যদি গোটা ডেটা সেন্টারটাকে একটা ঠাণ্ডা ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হত। আগেকার দিনে কম্পিউটারগুলোকে বাতানুকূল ঘরে রেখে কাজ করাই রীতি ছিল। কিন্তু ডেটা সেন্টারগুলোর ক্ষেত্রে এই বিরাট পরিমাণের তাপ নিষ্কাশনের জন্য তা খুব একটা সুদক্ষ ব্যবস্থা নয়। এই তাপ এলাকার ঠিক বাইরের বায়ুমণ্ডলকে গরম করে দেবে। এর বিকল্পে যে ব্যবস্থা চালু

হল, তাতে কম্পিউটারের চিপগুলোর ভেতর দিয়ে বা নীচ দিয়ে খাতব টিউব বসিয়ে তার মধ্যে দিয়ে জল চালিয়ে ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা, যা অনেক বেশি সাশ্রয়ী। অর্থাৎ এই টিউবগুলির ভেতর দিয়ে ঠাণ্ডা জল যাবে, তার সংস্পর্শে এসে তপ্ত আইসি চিপগুলো ঠাণ্ডা হবে, আর জল গরম হয়ে বেরিয়ে যাবে। একটা পাম্প দিয়ে জল আসা-যাওয়ার ব্যবস্থা চলতে থাকবে। কিন্তু সেই গরম জলের কি হবে? তার জন্য উন্নতমানের ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থায় কুলিং টাওয়ার আছে, সেগুলিতে এই গরম জল আবার ঠাণ্ডা হয়ে পুনর্ব্যবহারের জন্য ফিরে আসে। কিন্তু এই কাজে একটা বিরাট পরিমাণের জল গরম হয়ে বাষ্পীভূত হয়ে আবহাওয়ামণ্ডলীতে মিশে যায়। সেগুলি আর ব্যবহার করার উপায় নেই। এই জল হয়ত মাটির অনেক গভীর থেকে পাম্প করে তোলা হয়েছে, কিন্তু যেখান থেকে এসেছে সেখানে ফিরে যাবার তার উপায় নেই। কেউ হয়ত প্রশ্ন করতে পারেন, মিষ্টি জলের বদলে সমুদ্রের জল দিয়ে কি ঠাণ্ডা করা সম্ভব? সেটি সম্ভব নয়, কারণ সমুদ্রের জলে যে নানারকমের লবন ও রাসায়নিক আছে সেগুলি টিউবের মধ্যে দিয়ে যাবার সময়ে টিউবের ভেতরের দেওয়ালে জমা হয়ে পাতলা একটা তাপ অপরিবাহী স্তর তৈরি করে, তাতে ওই গরম আই সি চিপ থেকে তাপ নিষ্কাশন বাধাপ্রাপ্ত হয়। কাজেই মিষ্টি জলই এখন অবধি একাজে বড় ভরসা।

এক একটা ডেটা সেন্টারের এই কাজে কত জলের প্রয়োজন হয়? হিসেবটা কিন্তু আঁতকে ওঠার মতোই। একটা বড় ডেটা সেন্টার চালাতে দিনে জল লাগে আনুমানিক ৫০ লক্ষ গ্যালন (১ গ্যালন = ৩.৭৮ লিটার)। অনুমান করা হয়, এই পরিমাণ জল দশ হাজার থেকে পঞ্চাশ হাজার লোকবসতির কোনো শহরে দৈনিক সরবরাহের জন্য যথেষ্ট। ডেটা সেন্টারগুলি চালাতে মোট কত জল লাগে তা কোনো কোম্পানিই ভাল করে জানায় নি। তবে গুগল জানিয়েছে যে তার সমস্ত ডেটা সেন্টার মিলিয়ে ২০২৩ সালে জল লেগেছিল ৫১০০ কোটি (৫১ বিলিয়ন) গ্যালন। আর এর ৩১ শতাংশ আসে বিভিন্ন মিষ্টি জলের ভাণ্ডার থেকে। মনে রাখতে হবে, অনেক ডেটা সেন্টার তৈরি হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনা প্রদেশের মতো মরুভূমি অঞ্চলে। আবার দেশে ব্যাপ্সালোরে, হায়দ্রাবাদে অনেক শহরে প্রচুর ডেটা সেন্টার তৈরি হচ্ছে, যেখানে ভূগর্ভস্থ জলই প্রধান জলের উৎস, আর সেই জলস্তর বিপজ্জনকভাবে নিচে নেমে যাচ্ছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এ আই-এর জলের খাই কতখানি তা জানার জন্য আমেরিকার একটি নামি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা চালানো হয়েছিল। দেখা গেল, কোনো এ আই সফটওয়্যার চালিয়ে যদি ১০০ শব্দের কোনো ছোট লেখা লিখতে হয়, তবে তার জন্য জল খরচ হবে আনুমানিক ৫০০ মিলিলিটার, অর্থাৎ একটি ছোট জলের বোতলের সমান। চিন্তা করুন, কারণে অকারণে আমরা চ্যাটজিপিটি বা জেমিনির মতো এ আই চালিয়ে প্রতিদিন আমরা কত জল খরচ করছি!

কোনো ডেটা সেন্টারের জলের খিদে কতখানি তা বোঝাতে একটি সূচক সাধারণত ব্যবহার করা হয়। একে বলা হয় Water Usage Effectiveness, সংক্ষেপে WUE। একটি ডেটা সেন্টার যদি এক ইউনিট (KWh) বিদ্যুৎ ব্যবহার করে, তবে সেটিকে ঠাণ্ডা করতে যে পরিমাণ জলের প্রয়োজন সেই মানটিই তার WUE। আর তার একক লিটার/কিলোওয়াট আওয়ার। বর্তমানে সাধারণ একটি ডেটা সেন্টারে এর গড় মান হল ১.৯ Litre/KWh।

এ ছাড়াও দেখা গেছে, একটি ডেটা সেন্টার থেকে যে বিপুল পরিমাণে তাপ বায়ুমণ্ডলে গিয়ে মেশে তা আবহাওয়া মণ্ডলীতে একটা 'হটস্পট' তৈরি করতে পারে। আর কোনো এক জায়গায় এই স্থানীয় তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রভাব প্রায় ১০ কিলোমিটার দূর অবধি অনুভব করা যায়। আবার ডেটা সেন্টারগুলিতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য ব্যবহার হচ্ছে বেশ কিছু বড় বড় ডিজেল জেনারেটর। এগুলি চলাকালীন যে শব্দ ও বর্জিত গ্যাসের দূষণ ছড়ায় সেটাও অগ্রাহ্য করার মতো না। আমরা অবশ্য এর মধ্যে ডেটা সেন্টারে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ লাগে, তেল-কয়লা-জল দিয়ে তা তৈরি করতে গেলে কতখানি জলের প্রয়োজন হয় এবং কতখানি দূষণ হয়, তার হিসেব করি না। হিসেব করি না ডেটা সেন্টারের ব্যবহৃত কম্পিউটার ও বিভিন্ন বৈদ্যুতিন যন্ত্রাংশ তৈরি করতে কত পরিমাণ জল প্রয়োজন। এই অঙ্কগুলোও বিরাট।

ডেটা সেন্টারগুলি সব গড়ে উঠছে বিভিন্ন মহানগরের উপকণ্ঠে। কলকাতায় এগুলি হচ্ছে সল্টলেক-নিউটাউন চত্বরে। মহানগরের বুকে এই বিরাট পরিমাণ বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে দরকার আরও উন্নত বৈদ্যুতিক পরিকাঠামো (ট্রান্সফর্মার, ব্রেকার, টাওয়ার, কেবল ইত্যাদি)। অল্প জায়গায় কেন্দ্রীভূত বিরাট পরিমাণের বৈদ্যুতিক লোড সরবরাহ করতে গিয়ে বৈদ্যুতিক সরবরাহ ব্যবস্থা বা গ্রিডের উপরেও যচ্ছেট চাপ পড়ে। সামান্য সময়ের জন্য চাহিদা যোগানের তারতম্যের

ফলে গোটা বৈদ্যুতিক সরবরাহ ব্যবস্থা বানচাল হয়ে যেতে পারে। তার জন্যেও বাড়তি ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। তা করতে গিয়ে আশেপাশের এলাকায় বিদ্যুতের দাম বেড়ে যাচ্ছে। এর অন্যতম কারণ ডেটা সেন্টারে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য বৈদ্যুতিক পরিকাঠামো খাতে ব্যাপক খরচ। আর এই খাতে খরচ সাধারণ বিদ্যুৎ গ্রাহকদেরও সমানভাবে বহন করতে হচ্ছে। এর সাথে ডেটা সেন্টার থেকে উদ্ভূত পরিবেশ দূষণের আশঙ্কা বিভিন্ন দেশে দিন দিন প্রকাশ্যে আসছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বিভিন্ন দেশের নানা জায়গায় ব্যাঙের ছাতার মতো ডেটা সেন্টার বসানোর বিরুদ্ধেও নাগরিক আন্দোলন প্রকট হচ্ছে। একটি প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে যে ২০২৬ সালের মে মাস অবধি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ৭০টি পৌরসভায় বা স্বশাসিত এলাকাতে আইন করে নতুন ডেটা সেন্টার বসানো নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই সংখ্যাটা ক্রমশ বেড়েই চলেছে।

বর্তমান যুগে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ক্লাউড স্টোরেজ ও কম্পিউটিং প্রযুক্তির ব্যবহারকে এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছে। কাজেই ডেটা সেন্টারের ব্যবহার দিনে দিনে বাড়বেই। কিন্তু প্রয়োজন একটা নতুন ডেটা সেন্টার বসানোর আগে হিসেব নিকেশ করা, এতে কত বিদ্যুৎ লাগবে, কত জল লাগবে, সেগুলি কোথা থেকে আসবে, এগুলি কত দূষণ তৈরি করবে ইত্যাদি। লোভী ব্যবসায়ীরা সব সময় চেষ্টা করবে এই সব সম্ভাব্য পরিবেশ দূষণকে খাটো করে দেখানোর, যাতে এগুলি দূর করার জন্য যত কম টাকা ব্যয় করতে হয়। সেই সাথে প্রয়োজন এ ব্যাপারে ব্যাপক মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা, সেই সাথে সরকারি আইন প্রণয়ন এবং তার কঠোর বাস্তবায়ন। তা না হলে বিভিন্ন জায়গায় যে হারে সেন্টার বসানো শুরু হয়েছে, তাতে খুব অল্পদিনেই সারা বিশ্বজুড়েই ডেটা সেন্টার থেকে উদ্ভূত পরিবেশ দূষণ এক বিপজ্জনক পর্যায়ে চলে যেতে পারে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির আর একটা বাড়তি বিপদ—উন্নত বিশ্বের পরিবেশ আন্দোলনের তাড়া খেয়ে ব্যাপকভাবে ডেটা সেন্টারগুলি এশিয়া-আফ্রিকার গরিব দেশগুলিতে সরিয়ে নিয়ে যাবার প্রবণতা শুরু হওয়ার সম্ভাবনা।

বিজ্ঞানীদের কাছেও আজ বড় চ্যালেঞ্জ, কিভাবে কম্পিউটারের চিপগুলিকে আরও দক্ষ করে তোলা যায়, যাতে তারা আরও কম বিদ্যুৎ অপচয় করে বেশি কাজ করতে পারে। সেই সাথে কিভাবে জল দিয়ে তাপ নিষ্কাশনের ব্যবস্থা আরও উন্নত করা যায়।

প্রাচুর্যের মাশুল

গৌতম মিস্ত্রী

মনে করুন, পঞ্চাশ বছরের আগের একজন এমবিবিএস, মানে পাশ করা জেনারেল ফিজিসিয়ান ডাক্তারকে আজ এক কর্পোরেট হাসপাতালে রোগী দেখার জন্য টাইম মেশিনে চাপিয়ে আনা হল। রোগীর চেয়ে ডাক্তার বেশি ধন্দে পড়বেন। সরলমতি ডাক্তার তাঁর প্রথম প্রশ্নের উত্তরে ঘায়েল হতে বাধ্য। রোগীর প্রতি প্রশ্নটা ছিল ‘আপনার কী কষ্ট?’

ডাক্তারের চেম্বারে রোগীরা আজকাল কষ্টের কথা বলেন না। চেপে ধরলে বোঝা যায় রোগীর কী কষ্ট সেটা রোগীই জানেন না। রোগীর আত্মীয়স্বজন রোগীর চেয়ে আরও কম জানেন। রোগী আর তাঁর আত্মীয় পরিজন সমবেত কোরাসে কিছু বলেন। সেটা ডাক্তার বোঝেন না। রোগী আর তাঁর পরিজনদের একলা বলতে বললে কারোর মুখে কথা সরে না। রোগীকে চেপে ধরলে রোগী বলেন, আমি কিছু জানি না, আমার একগাদা রক্তের পরীক্ষা হয়েছে। সেই পরীক্ষায় নাকি কী সব গুণগোল আছে। আগে ভালোই ছিলাম। হোল বডি চেক আপের ফলাফল জানার পরে আমার চেয়ে আমার আত্মীয় পরিজনের উৎকণ্ঠার চাপে আমার বুকে হাঙ্কা চিনচিন করে ব্যথা শুরু হল। আধুনিক বাংলায় অনভ্যস্ত পুরাতনী ডাক্তার বলেন, ‘চিন চিন’ না, ‘কিন কিন?’ রোগী বলেন, তা ঐরকম কিছু একটা হবে। চিন চিন বা কিন কিন —ব্যথা দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না। ভাগ্যিস করোনারি আঞ্জিওগ্রাম নামের একটা পরীক্ষা আবিষ্কার হয়েছে! ডাক্তারের কাজ সহজ হয়ে গেছে সেই থেকে।

ব্যথা দেখা যায় না। ব্যথা সে বুকেই হোক, পেটে কিংবা মাথায়ই হোক না কেন, ব্যথা ধরা ছোঁয়ার বাইরে। স্টেথোস্কোপ দিয়েও ব্যথার নাগাল পাওয়া ভার। ব্যথার হাল হকিকত জানার জন্য পুরাতনী ডাক্তারদের একটা বিলুপ্তপ্রায় বিদ্যা ছিল। সেই বিদ্যার নাম ‘ক্লিনিক্স’—বাংলায় বলা যায় নাড়ি-টেপা। নাড়ি-টেপা কেবল কজির পালস গোনা নয়, বৃহদার্থে ‘হিস্টি টেকিং’ অর্থাৎ ব্যথা সহ রোগলক্ষণ শোনা আর তার বিশ্লেষণও বটে। রোগীর শারীরিক ভাষায় কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। খুঁতখুঁতে ডাক্তার প্রশ্ন করেন—ব্যথা শুরু হবার সময় আপনি কী করছিলেন? কতক্ষণ ব্যথা ছিল? একনাগাড়ে

ব্যথা ছিল, না মাঝে মাঝে ব্যথা হচ্ছিল? গতকাল ক’বার ব্যথা হয়েছিল? ব্যথা হবার সময় আপনি কী করছিলেন? ব্যথা শুরু হবার পরে আপনি হাতের কাজ থামিয়ে শুয়ে পড়লেন না কাজ চালিয়ে গেলেন? ডাক্তারের জেরা ফেলুদা আর ব্যোমকেশকেও বুঝি হার মানায়! এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে রোগী অনেক সময় খেই হারিয়ে এক এক সময় এক এক রকমের উত্তর দেন। প্রশ্নের উত্তরের চেয়ে রোগীর শারীরিক ভাষা লক্ষ্য করেন বিচক্ষণ ডাক্তার। এই সব প্রশ্নের উত্তর রোগীর আত্মীয় পরিজনদের কাছেও অজানা। আটের দশকের এক ডাক্তার শিক্ষকের উক্তি— ‘কেবল রোগ লক্ষণ বিশ্লেষণ করে যদি রোগ নির্ণয় করতে না পার, রোগীর শারীরিক পরীক্ষা আর গাদা গাদা পরীক্ষা করে রোগ ধরতে পারবে না।’

আজকাল এক নতুন চল হয়েছে। ভারি পদমর্যাদার চাকরিজীবীদের বিনে পয়সায় ‘হোল বডি হেলথ চেক আপ’-এর বন্দোবস্ত করে সরকারি আর বেসরকারি সংস্থা। ঠিক বিনে পয়সায় নয়, এই সব পয়সা কর্মীদের মাইনে থেকে কাটা হয়। শহরের নামকরা ডায়াগনোস্টিক সেন্টারের পরীক্ষার ফলাফল মোটা ফাইলে বন্দি হয়ে হাতে আসে। এই পরীক্ষার অন্তিম ফলাফল কখনও একদম স্বাভাবিক হয় না। পরীক্ষার ফল যে স্বাভাবিক নয়, সেটা বোঝানোর জন্য বইয়ের পাতা থেকে স্বাভাবিক সীমার নির্যাস রিপোর্টের সঙ্গে ছাপানো থাকে। রিপোর্ট স্বাভাবিক না হলে, আরও উন্নত পরীক্ষার পরামর্শের তালিকাও দেওয়া থাকে। সেই সব দেখে আপনার বুক ‘ব্যথা ব্যথা’ হলে সেটা অস্বাভাবিক নয়। ‘ব্যথা ব্যথা’ অর্থাৎ ব্যথার এই দ্বিত্ব প্রয়োগ আসলে ‘ব্যথার’ এক অস্পষ্ট অবতারণা। সেটা আদৌ ব্যথা কিনা সন্দেহ থেকে যায়। গুগল বা এ-আইকে জিজ্ঞেস করলে আরও গুলিয়ে দেয়। অগত্যা হাসপাতালের বিশেষজ্ঞের চেম্বারে হাজির হতে হয়। হাসপাতালের সুপার স্পেশালিস্ট ডাক্তার কম কথা বলেন, শোনেন আরও কম। রিপোর্টের জঞ্জাল থেকে স্পেশালিস্টের বিভাগ অনুযায়ী ডেটা সংগ্রহ করে এক এক স্পেশালিস্ট এক একটা উন্নত পরীক্ষার ফর্দ বানিয়ে বিদায় করে দেন।

ভেবেছিলেন একটা সদুত্তর পাবেন। তার বদলে হার্টের, লিভারের, কিডনির দুরবস্থার মাপজোকের জন্য আপনি হাসপাতালে সুদীর্ঘ চরকি কাটার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

চিকিৎসা পরিষেবা কর্পোরেটের কজায় পড়ার আগে রোগ আর রোগের কারণ আবিষ্কার করা হত, ওষুধ আবিষ্কার হত তার পরে। চিকিৎসা বিষয়ক বৈজ্ঞানিক গবেষণা এখন সরকারি ইউনিভার্সিটির নয়, আন্তর্জাতিক ওষুধ নির্মাতাদের দাক্ষিণ্যে চলে। বিস্তারিত ডলার খরচ করে পঞ্চাশ রকমের ওষুধের পরীক্ষানিরীক্ষার পরে হয়ত বা একটা ওষুধ ক্লিনিকাল ট্রায়ালে কোনমতে পাশ করল। কিন্তু সেই ওষুধ কোনো বিরল রোগের জন্য, ওষুধ কোম্পানির গবেষণার খরচ উঠবে না। এমতাবস্থায় ওষুধ কোম্পানি একটা কায়দা করে সদ্য পাশ করা ওষুধের জন্য নতুন নতুন অসুখ নির্মাণ করে। নতুন অসুখ বানানো যায় না সত্যিই, তবে পুরনো রোগ লক্ষণের নতুন নাম বানিয়ে নতুন ওষুধের বাজার তৈরি করা হয়। স্বল্পবাক, লাজুক স্বভাবের মানুষদের রোগী বলা যায় কী? প্রিয়জন হারানোর শোকে বিলাপ করা কী অসুখ? এই সব অত্যন্ত স্বাভাবিক মানবিক বৈশিষ্ট্যকে ‘সোশাল ফোবিয়া’ নাম দিয়ে মানসিক অবসাদের ওষুধের বাজার বাড়ানোর চাতুরি ফাঁস করে ব্রিটিশ জার্নাল অফ ফার্মাকোলজি ২০২১ সালে (<https://bpspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bcp.14835>)।

কিডনির কর্মদক্ষতা মাপার জন্য রক্তের ক্রিয়াটিনিন মাপা যথেষ্ট, কিন্তু কাজে না লাগলে প্যাকেজের দৌলতে সামান্য অতিরিক্ত খরচে রক্তের ইউরিয়া মাপা হয়ে যায়। ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা প্রাসঙ্গিক না হলেও সেই পরীক্ষা করার জন্য আপনার চাহিদা তৈরি করে দেয় সক্রিয় মিডিয়া। আপনি হয়ত মেদবহুল, তাতে আপনার মাথা ব্যথা না থাকলেও আপনার মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয় আপনার লিভারের সোনোগ্রাম, রক্তের লিভার ফাংশান টেস্ট আর লিভারের ফাইব্রোস্ক্যান (Fibroscan, transient elastography) করা দরকার। অন্তিমে আপনাকে খেতে হয় দামি অপ্রমাণিত অকাজের লিভারের চর্বি কমানোর আয়ুর্বেদিক ওষুধ।

এই সবই মধ্যবিত্তদের জন্য। ধনীরা এসবের উর্ধ্বে থাকেন, গরীবদের এই মেকি বিলাসে গা ভাসানোর উপায় নেই বলে পার পেয়ে যান। ধনীও নন, তেমন গরীবও নন, সংখ্যাগুরু মধ্যবিত্ত প্রাচুর্যের মাশুল গোনেন।

উমা

অরণ্যের কার্বন শোষণ ক্ষমতা

শান্তনু গুপ্ত

ভারতের জলবায়ু বিজ্ঞানীরা এখন আর উষ্ণায়ন রোধ করার কথা বলতে পারছেন না। তাঁরা ভাবছেন, এই ক্রমাগত বেড়ে চলা হিট ওয়েভের সাথে দেশের মানুষ কিভাবে আর কি উপায়ে নিজেদের মানিয়ে নেবেন। গত শতাব্দীর তুলনায় শেষ দশ বছরে (২০১৫-২০২৪) ভারতের গড় তাপমাত্রা প্রায় ০.৯ ডিগ্রি বেড়েছে, সাথে বেড়েছে উষ্ণতম দিনের সংখ্যা (Chirag Dhara and R. Krishnan 2025)। পশ্চিম আর উত্তর ভারতে এই হিট ওয়েভের গড় তাপমাত্রা বিংশ শতাব্দীর উষ্ণতম দিনগুলির থেকে গড়ে প্রায় ১.৫-২ ডিগ্রি বেশি। হিট ওয়েভের সাথে পাল্লা দিয়ে জুন থেকে অক্টোবর যোগ্য সঙ্গত দিচ্ছে খুব কম সময়ে মাত্রাতিরিক্ত বৃষ্টিপাত আর অস্বাভাবিক বন্যা (Gopinath Konda 2025) ২০২৪ ছিল ১৯০১ সাল থেকে ১২৪ বছরের মধ্যে ভারতের উষ্ণতম বছর। শেষ কয়েক দশকে ভারত মহাসাগর আর আরব সাগরের উপরিভাগের দ্রুত উষ্ণায়ন মৌসুমি বায়ুকে প্রভাবিত করে সমুদ্রে অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা তৈরি করেছে। উত্তরপূর্ব আর হিমালয়ে অতি বৃষ্টি আর উত্তর ভারত, মধ্য ভারত, পশ্চিম ভারত জুড়ে খরা। একদিকে ভূমিধ্বস, ফ্ল্যাশ ফ্লাড আবার অন্যদিকে জলের জন্য হাহাকার। ২০২৬-এ গোদের ওপর বিষফোঁড়া হিসেবে প্রায় এসে গেছে সুপার এল নিনো, যার প্রভাব এখন হিমালয় থেকে দক্ষিণাত্যের প্রবল উষ্ণ দিনগুলির মাধ্যমে আমরা সবাই বুঝতে পারছি।

এই উষ্ণায়ন ঠেকাতে আমরা মোটামুটি নির্ভর করে আছি বনসৃজনের ওপর, নতুন লাগানো গাছেরা বাতাসের কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করে উষ্ণায়নকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে। ফরেস্ট হল পৃথিবীর কার্বন সিল্ক। বিশ্বের ৫০% গ্রিনহাউস গ্যাস যা জ্বালানি থেকে নির্গত হয়, যা শুষ্ক নেয় ফরেস্ট (Pan 2024)। সব মিলিয়ে পৃথিবীর অরণ্য বাতাসের CO₂-এর ৩০% শোষণ করে নেয় (Ruehr 2023)। তাই সঙ্গত কারণেই জলবায়ু পরিবর্তন রূখতে ভারতে বনসৃজনের কথা ভাবা হচ্ছে বা বনসৃজন করা হচ্ছে। কিন্তু শুধু বনসৃজন করে কি ভারতের জলবায়ু

পরিবর্তনকে রোখা যাবে? কারণ পৃথিবীর পরিবেশ একটা অখণ্ড সিস্টেম। এখানে বন যেমন কার্বন সিঙ্ক তেমনি জলবায়ুর ব্যাপক পরিবর্তন আবার জঙ্গলের কার্বন শুষে নেওয়ার ক্ষমতাকে এমনিতেই কমিয়ে দিচ্ছে। বনসৃজন জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হতে পারে। কিন্তু উল্টোদিকে আবার প্রবল জলবায়ু পরিবর্তন সিস্টেমের মধ্যে নানা পরিবর্তন এনে সবুজের বিস্তারকেই রুখে দিতে পারে— একে আমরা বিজ্ঞানের ভাষায় বলি নেগেটিভ ফিডব্যাক। জলবায়ুর পরিবর্তন অরণ্যের বাস্তুতন্ত্রকে শুকনো করে দিচ্ছে (aridity stress) আর ভবিষ্যতে এই বাড়তে থাকা শুষ্কতা বনের মাটির আর্দ্রতাকে অনেক কমিয়ে দিয়ে সবুজের বৃদ্ধি কম করে দেবে, গাছের কার্বন শোষণ ক্ষমতা কমিয়ে দেবে, প্রকারান্তরে পুরো কার্বন চক্রকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে দেবে (Seneviratne 2021)।

এক বিরাট সবুজ অঞ্চল নিরক্ষীয় অঞ্চলের কাছেই অবস্থিত আমাদের এই ভারতীয় উপমহাদেশ। ঐতিহাসিকভাবে এখানকার সমাজ কৃষিজীবী বলে এখনও ভারতে কিছু আদিম প্রাকৃতিক বনাঞ্চল রয়েছে যেমন অরুণাচল, আন্দামানের রেইন ফরেস্ট। এইসব ঘন জঙ্গল পৃথিবীর সর্বমোট কার্বন সিঙ্কের প্রায় সাত শতাংশ ধরে রেখেছে (Haris and Gibbs 2021)। আমাদের ল্যান্ড এরিয়ার ২১.৭১% হল প্রাকৃতিক অরণ্য, আর এই শতাংশ পৃথিবীর নিরিখে অষ্টম সর্ববৃহৎ (ISFR, 2021)। পৃথিবীর দুটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জীব বৈচিত্র্যপূর্ণ অঞ্চল হিমালয় আর পশ্চিমঘাট পর্বতমালা আমাদের এই ভারতবর্ষেই আছে।

বন-জঙ্গলে মানুষের বিস্তার বাড়ছে এবং জলবায়ু পরিবর্তন রোধে আমরা সবুজ অঞ্চল বাড়ছি। কিন্তু এর কত অংশ বৈজ্ঞানিকভাবে অরণ্যের বাস্তুতন্ত্র মেনে করছি? বলা ভাল, বিগত কয়েক বছরের এই সবুজের বিস্তার অরণ্যের বিস্তার নয়, এর ৮৬.৫% হল শস্যক্ষেত্রের সবুজ যার বিস্তার ঘটছে সেচের জলের অতি ব্যবহারে (Kuttippurath and Kashyap, 2023) ভারতে যতটা অরণ্য অঞ্চল বাড়ছে ততটা বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ হচ্ছে না, বৈজ্ঞানিক মডেলগুলি জানাচ্ছে যে ভারতের অরণ্য অঞ্চলগুলোর কার্বন শোষণ করার ক্ষমতা ভবিষ্যতে আরও কমবে। এর মূল কারণ হল ভবিষ্যতে ভারতে জলবায়ুর পরিবর্তনের হার আরও দ্রুত হবে (Bejagam 2024)। আসলে গাছের সালোকসংশ্লেষ আর সেই সঙ্গে বাতাস থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড টেনে

নেওয়া এই গোটা পদ্ধতিটাই পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে বেশ সংবেদনশীলভাবে পাল্টায় (Yan 2019)। অরণ্য হয়ত আগের মতোই সবুজ দেখাবে, কিন্তু পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে সেই অরণ্যের কার্বন শোষণ ক্ষমতা আগের চেয়ে অনেক কমে গেছে (Zhang 2024), এটাকে মাপার পদ্ধতিকে বলে— Ecosystem Photosynthetic Efficiency (EPE), যেটা ভারতের জলবায়ুর পরিবর্তন বাড়ার সাথে সাথে কমে।

ভারতে এই বিষয়টি নিয়ে আই আই টি খড়গপুরের বিজ্ঞানী রাহুল কাশ্যপ আর জয়নারায়নন একটি মনোজ্ঞ গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন (Resources, Conservation & Recycling Journal), সেখানে এরা সমস্ত পরিবেশের পরিবর্তনের সূচকগুলি পরীক্ষা করে দেখেছেন। ২০০২-২০২০ সালের মধ্যে ভারতে বাতাসে CO₂-এর পরিমাণ দ্রুত হারে বেড়েছে (২.১ পিপিএম/বছর) (Kuttippurath 2022)। আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী ভারত ২০৩০ সালের মধ্যে ২৬ মিলিয়ন হেক্টর পতিত জমিকে সবুজে রূপান্তরিত করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ২০৭০ সালের মধ্যে ভারতকে নেট জিরো emission-এর টার্গেট পুরো করতে হবে (ISFR 2023)। দেখা যাচ্ছে কৃষিযোগ্য সবুজ আচ্ছাদনের পরিমাণ ভারতে বাড়ছে (economic crop termed as forest green)। কিন্তু এইসব সবুজের কার্বন টেনে নেওয়ার ক্ষমতা প্রাকৃতিক অরণ্যের থেকে অনেক কম। এইসব plantation ফরেস্টের গ্রস উৎপাদন অনেক কম। এছাড়াও লাগানো জঙ্গলেরও কার্বন উৎপাদন জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে কমে যাচ্ছে। একটা সীমার পর বাতাসের তাপমাত্রা বেড়ে গেলে গাছের গ্রস সালোকসংশ্লেষের ক্ষমতা আর না বেড়ে উল্টে কমতে থাকে (Das 2023)। ২০১০-২০১৯ EPE-এর মধ্যে ভারতে আগের দশকের তুলনায় (২০০০-২০০৯) অনেক বেশি মাত্রায় কমে গেছে। সবুজ বাড়লেও এই উচ্চ গড় তাপমাত্রায় সালোকসংশ্লেষের হার অনেক কমে গেছে। তাপমাত্রা বাড়ার সাথে এই কার্বন সংশ্লেষ বেশি হারে কমেছে প্রাকৃতিক প্রাচীন অরণ্যে, যেমন, পূর্ব হিমালয়ে কিংবা পশ্চিমঘাট পর্বতে। এইসব প্রাচীন ইকো সিস্টেমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নতুন লাগানো সবুজ অঞ্চলের থেকে আরও বেশি কারণ এইসব ইকো সিস্টেম জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে একেবারেই মানিয়ে নিতে পারছে না। এইসব প্রাচীন অরণ্যে মাটিতে আর্দ্রতা কমে গেছে, তুলনামূলকভাবে বাতাসের তাপমাত্রা বেড়ে গেছে, বাতাসের

আর্দ্রতাও কমে গেছে, উষ্ণায়নের প্রভাবে আগুন লাগার ঘটনা এত বেড়ে গেছে যে ইকো সিস্টেমের কার্বন টেনে নেওয়ার ক্ষমতা একেবারেই কমে গেছে। অথচ এগুলো ভারতের সবচেয়ে ভার্জিন ফরেস্ট, যার ওপর ভারতের জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ বা তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ নির্ভর করছে। হিমালয়ে মাত্রাতিরিক্ত ভূমিধ্বস (landslide) এইসব ক্রিটিক্যাল ইকো সিস্টেমের কার্বন টানার ক্ষমতা আরও কমাচ্ছে। হিমালয় আর পশ্চিমঘাটের এইসব পুরনো ভার্জিন ফরেস্টের কম আর্দ্রতা, বেশি তাপমাত্রা আর ফরেস্ট ফায়ারের বিরুদ্ধে লড়ার ক্ষমতা খুব কম। এর ওপর মাঝে মাঝেই জঙ্গল কেটে চা আর কফি বাগান, কিংবা টুরিস্ট রিসর্ট। জঙ্গলের কার্বন শোষণ করার ক্ষমতা আরও কমিয়ে দিচ্ছে। ভারতে প্রাচীন অরণ্য কেটে তার জায়গায় হচ্ছে নতুন বনসৃজন, যার CO₂ টেনে নেওয়ার ক্ষমতা খুবই কম (Brandt 2024)। স্ল্যাশ অ্যান্ড বার্ন কৃষি, বুম চাষ, প্ল্যান্টেশন, জবরদখল, মাইনিং, ট্যুরিজম সব মিলে অরণ্যের সালোকসংশ্লেষ হার কমছে (ISFR 2023)। ২০০১-২০২০-র মধ্যে পশ্চিমঘাটে ৭% বন ধ্বংস হয়ে গেছে। ফরেস্ট ক্যানপি উন্মুক্ত হয়ে তার কার্বন উৎপাদন কমছে। অরম্যের কার্বন শোষণ ক্ষমতা কমে যাওয়া শুধু যে ভবিষ্যৎ উষ্ণায়ন বাড়াবে তাই নয়, এটা ভারতের অর্থনীতিকে দুর্বল করে দেবে। টিম্বার উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হবে, কাঠের দাম বাড়তেই থাকবে, উৎপাদনহীন সবুজায়ন বাড়াবে, আর অরণ্যবাসীদের জীবন ও জীবিকা বিপর্যস্ত হবে। লোকাল প্রজাতির গাছ বিলুপ্তির দিকে যাবে। পূর্ব হিমালয় আর পশ্চিমঘাটের অরণ্য নাশ আরও অনেক জলবায়ু বিপর্যয়ের জন্ম দেবে। আরও মেঘ ভাঙ্গা বন্যা আরও ভূমি ধ্বংস আর সাথে সাথে জান মালের ক্ষতি। আমাদের বুঝতে হবে এটা একটা চক্রাকার সিস্টেম—গাছ কাটলে কার্বন শোষণ কমবে। আবার গ্রিন হাউস গ্যাসের সোর্স না কমালে শুধু বনসৃজন করে কিচ্ছু হবে না কারণ তাপমাত্রা একটা লিমিটের ওপর চলে গেলে শুকনো বাতাস মাটির আর্দ্রতা কেড়ে নিয়ে গাছের কার্বন ধারণ ক্ষমতা কমিয়ে দেবে। সেটা গভীর বনাঞ্চলে আরও বেশি হারে হবে। শুকনো জলবায়ুতে ফরেস্ট ফায়ার অরণ্যের কার্বন ধারণ ক্ষমতা আরও কমিয়ে দেবে। (নেগেটিভ ফিডব্যাক)। তাই শুধু বন সৃজন নয়, প্রযুক্তির মাধ্যমে বাতাসের কার্বনকে শোষণ করার পদ্ধতির দিকে নজর দিতে হবে।

এছাড়াও আরও একটা দিক আছে—কে বেশি বাতাসের

কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO₂) শোষণ করতে পারে? মাটির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা অরণ্য নাকি সমুদ্রের ওপর ভাসমান জলজ শৈবালের দল? আমরা ছোট থেকে সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে অরণ্যের কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করার ক্ষমতা পড়ে এলেও আসলে কিন্তু সমুদ্রে ভাসমান জলজ শৈবাল বা ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন বাতাসের CO₂ অরণ্যের থেকে বেশি শোষণ করতে পারে। পৃথিবীর সমস্ত সালোকসংশ্লেষ জনিত উৎপাদনের (primary productivity of ecosystem) প্রায় অর্ধেকটাই আসে সমুদ্রের ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন থেকে। সমুদ্রের এই শ্যাওলার দল বাতাস থেকে বছরে প্রায় ৩৫-৬৫ গিগাটন কার্বন (science.nasa) শুষে নেয়, যা পৃথিবীর সমস্ত অরণ্য মিলিতভাবে করতে পারে। মজার কথা এই যে সমুদ্রের এই ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনদের মোট ভর পৃথিবীর বনাঞ্চলের মাত্র এক শতাংশ, অথচ তারা বাতাসের ৫০ শতাংশ কার্বন শুষে নিতে পারে। তাই ভূমিতে গাছ কাটা পড়া যেমন বিপজ্জনক, তার থেকেও বেশি চিন্তার বিষয় যদি সমুদ্রের ওপর ভাসমান এই শ্যাওলার দল, যা সমুদ্রকে নীলচে-সবুজ রঙ দেয়, তারা পৃথিবীর উষ্ণায়নের প্রভাবে হঠাৎ কমে যেতে থাকে। কারণ তারাই এই উষ্ণায়নকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।

সূত্রনির্দেশ :

Kashyap, R and K Jaya Narayanan (2025). Weakening of forest carbon stocks due to declining Ecosystem Photosynthetic Efficiency under the current and future climate change scenarios in India. *Resources, Conservation & Recycling*. : 222 (108478)

Krishnan, R et. al (2020) Introduction to Climate Change Over the Indian Region. Springer Open

<https://science.nasa.gov/earth/earth>

উ মা

স্মার্ট মিটারের ভালো-মন্দ

অমিতাভ নন্দী

বর্তমানে একটা বহুল চর্চিত বিষয়—স্মার্ট মিটার। সাধারণ জনমানসে একটা প্রশ্ন জাগছে, স্মার্ট মিটার ভালো, নাকি খারাপ? পুরনো মিটার তো ভালই চলছিল। হঠাৎ করে কি এমন অসুবিধা হল যে, এই আধুনিক ডিজিটাল মিটার, যাকে আমরা পুরনো মিটার বলছি তা পাল্টাতে হবে? পাল্টালে সুবিধাটা কার হবে? বিদ্যুৎ গ্রাহকের না সরবরাহকারীর, যাদের আমরা বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থা বলে চিনি? যাঁরা এর বিরোধিতা করছেন তাঁদের কাছ থেকে এই প্রশ্নের উত্তরটা পাচ্ছি না।

ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ধাপে ধাপে স্মার্ট মিটার চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ১ আগস্ট ২০২৬-এর মধ্যে রাজ্য সরকারের সব দপ্তরে স্মার্ট মিটার স্থাপন বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। পাশাপাশি, রাজ্যের সকল সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক, এবং পুলিশ কর্মীদের তাঁদের নিজ নিজ বাসভবনে স্মার্ট মিটার লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার পর কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রক আগামী ৩ থেকে ৪ বছরের মধ্যে সারা বাংলায় দু'কোটি স্মার্ট মিটার বসাবার নির্দেশ দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের কর্মচারী সংগঠনগুলি এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে। তাঁদের মতে, ২০০৩ সালের বিদ্যুৎ আইন-এ স্মার্ট মিটার লাগানো বাধ্যতামূলক করা হয় নি। এছাড়াও, তাঁরা আশঙ্কা প্রকাশ করছেন যে এর ফলে সরকারি কর্মচারীদের উপর অতিরিক্ত আর্থিক বোঝা পড়তে পারে।

স্মার্ট মিটার কী — স্মার্ট মিটার হল এমন একটি বিদ্যুৎ মিটার যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহারের তথ্য প্রতিনিয়ত বিদ্যুৎ সংস্থার কাছে পাঠাতে পারে এবং চাইলে প্রি-পেইড ব্যবস্থাও যোগ করা যায়। এই মিটার সাধারণ ডিজিটাল মিটারের থেকে ভিন্ন, কারণ স্মার্ট মিটার দ্বিমুখী যোগাযোগের সুযোগ দেয়। মিটারটি বিদ্যুৎ সংস্থার কাছ থেকে নির্দেশ গ্রহণ করতে পারে; যেমন দূর থেকে সংযোগ বন্ধ করা বা বিদ্যুৎ মাশুল (টারিফ) পরিবর্তন এবং আপনার অত্যন্ত বিস্তারিত বিদ্যুৎ ব্যবহারের তথ্য (অর্থাৎ আপনি দিনের কোন সময়, কোন বিদ্যুৎ উপকরণ ব্যবহার করছেন) পাঠাতে পারে। তাই তথ্য সুরক্ষা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। এই যোগাযোগ ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য স্মার্ট মিটারে একটা ‘যোগাযোগের মডিউল’ থাকে। সাধারণত নিরাপদে

ডেটা পাঠাবার জন্য সেলুলার নেটওয়ার্ক (মোবাইল সিম), রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি (আর এফ) বা পাওয়ার লাইন কমিউনিকেশন (পিএলসি) ব্যবহার করে। এখানে যতটা জানা যাচ্ছে সেলুলার নেটওয়ার্ক ব্যবহার করা হবে। ফলে এই স্মার্ট মিটার-এর দাম নিশ্চয়ই পুরনো ডিজিটাল মিটারের থেকে বেশি হবে, রক্ষণাবেক্ষণ খরচও বেশি হওয়া স্বাভাবিক এবং এই সেলুলার নেটওয়ার্ক-এর একটা রোজকার খরচও আছে। এগুলো পক্ষান্তরে আমাদেরই ঘাড়ে চাপবে। সেলুলার নেটওয়ার্ক ব্যবহার করা স্মার্ট মিটারগুলি ‘যোগাযোগ নেটওয়ার্কের’ (কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক) মাধ্যমে তথ্য আদানপ্রদান করে। এই কারণে সাইবার নিরাপত্তার একটা বড় ঝুঁকি থেকেই যায়। কোনো সাইবার আক্রমণ হলে তথ্য চুরি বা সিস্টেমে বিঘ্ন ঘটানো সম্ভাবনা থাকে, ফলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হতে পারে। অত্যধিক বিদ্যুৎ বিল স্মার্ট মিটারের ক্ষেত্রে একটা বড় সমস্যা। আবার নেটওয়ার্ক সমস্যা, সফটওয়্যার ত্রুটি হার্ডওয়্যার সমস্যার কারণে মিটার রিডিং-এ ভুল হতে পারে।

দূর থেকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকার কারণে বিদ্যুৎ সংস্থা দূর থেকেই সংযোগ চালু বা বন্ধ করতে পারে। সমালোচকদের মতে, এতে গ্রাহকের ওপর সংস্থার নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পাবে। ডিজিটাল নির্ভরতা একটা সমস্যা হতে পারে, কারণ রিচার্জ, ব্যবহার পর্যবেক্ষণ বা অভিযোগের জন্য মোবাইল অ্যাপ বা অনলাইন পরিষেবার প্রয়োজন। বয়স্ক বা প্রযুক্তিতে অনভিজ্ঞ গ্রাহকদের জন্য এটি অসুবিধাজনক হতে পারে।

ডায়নামিক টারিফ— এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে না বিদ্যুৎ গ্রাহকের অর্থাৎ আমাদের কি সুবিধা হবে এই স্মার্ট মিটার ব্যবহার করে? পক্ষান্তরে গ্রাহকের ওপর বিদ্যুৎ সংস্থার নিয়ন্ত্রণ বাড়বে। তবে কি ভবিষ্যতে স্মার্ট মিটারের সঙ্গে ডায়নামিক টারিফ বা টাইম-অফ-ডে ভিত্তিক বিলিং ব্যাপারটা চালু হবে? সেক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে তখন চাইলেই বিদ্যুৎ দফতর সেটা চালু করে দিতে পারে, আপনার অনুমতি ব্যতিরেকে। এখানে একটু জেনে নিই ডায়নামিক টারিফটা কী? সাধারণভাবে অর্থনীতির চাহিদার সূত্র এবং বাজারের ভারসাম্য অনুযায়ী, অন্য সব কিছু অপরিবর্তিত থাকলে চাহিদা বৃদ্ধি হলে দাম বৃদ্ধি হবে। পিক আওয়ারে বেশি বিল। বিদ্যুতের চাহিদা বেশি

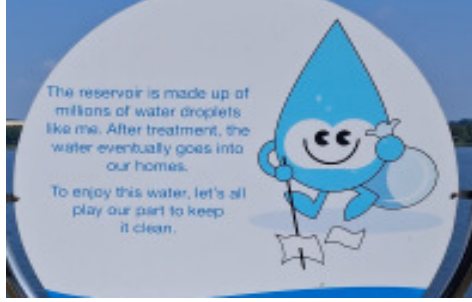
থাকলে (সাধারণত সন্ধ্যায়) প্রতি ইউনিটের দাম বেড়ে যায়। অনেকটা ভারতীয় রেলওয়ের রাজধানী বা শতাব্দী এক্সপ্রেসের মতো প্রিমিয়াম ট্রেনগুলোর ভাড়ার মতো। একইভাবে, উবার বা ওলা-র মতো অ্যাপগুলিতে যখন গাড়ির চাহিদা খুব বেশি থাকে (যেমন বৃষ্টির সময় বা পিক আওয়ারে), তখন সাধারণ ভাড়ার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি ডাইনামিক ফেয়ার বা সার্জ প্রাইস নেওয়া হয়।

সাধারণ ফ্ল্যাট রেটের তুলনায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রেট থাকায় বিলের হিসাব জটিল হয়ে যায়। গ্রাহকের পক্ষে কোন সময়ে কত চার্জ হচ্ছে তা বোঝা কঠিন হতে পারে। অফিসগামী মানুষ, শিক্ষার্থী অনেক সময় বাধ্য হবে পিক আওয়ারেই বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে। ফলে তারা তখন ‘বিদ্যুতের কম রেটের’ সময়ে তাদের বিদ্যুতের ব্যবহার সরিয়ে নিতে পারবেন না। নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনযাত্রার সময়সূচি নির্দিষ্ট, ফলে তারাও বেশি খরচের সম্মুখীন হতে পারেন। এক্ষেত্রে, বিদ্যুতের খরচ নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হতে পারে। গ্রাহককে জানতে হবে কখন কোন রেট কার্যকর হয়। ফলে, রিয়েল টাইম তথ্যের উপর এবং মোবাইল অ্যাপ, এসএমএস-র উপর নির্ভরতা বাড়বে। এক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত ত্রুটির ঝুঁকি থাকে, ফলে ‘ভুল সময়ের রেট’ প্রয়োগ হওয়ার অভিযোগ উঠতে পারে। আগে থেকে নির্দিষ্টভাবে মাসিক বিল অনুমান করা কঠিন হতে পারে, কারণ ব্যবহার কখন হচ্ছে তার উপর খরচ নির্ভর করবে। তবে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থাগুলোর মতে, ডায়নামিক ট্যারিফের উদ্দেশ্য হল গ্রাহকদের অফ পিক সময়ে বিদ্যুৎ ব্যবহারে উৎসাহিত করা, যাতে বিদ্যুৎ গ্রিডের উপর চাপ কমে এবং সামগ্রিকভাবে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার দক্ষতা বাড়ে।

উমা

৩২

চিত্রপত্র



প্রিয় সম্পাদক,

উৎস মানুষ এপ্রিল-জুন ২০২৬ সংখ্যায় প্রকাশিত অধ্যাপক পার্থপ্রতিম বিশ্বাস মহাশয়ের ‘ইন্দোরে জলদূষণে মৃত্যু...’ প্রবন্ধটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও সমরোপযোগী। এই প্রসঙ্গে আরো কিছু সংযোজন করতে চাই।

অধ্যাপক বিশ্বাস জল সংরক্ষণ বিষয়ে আলোচনায় বৃষ্টির জল ধরে রাখার উপর জোর দিয়েছেন। ছোটবেলায় দেখেছি গ্রামে-গঞ্জে ডোবা, পুকুর, দীঘিই জলের প্রকৃত উৎস। পুরুলিয়া শহরের জলের প্রধান উৎস জোড়াবাঁধ। বৃষ্টিপাত কম তাই এ জেলায় অনেক বাঁধ দেখা যায়।

সরকারের একটি বহুল প্রচারিত প্রকল্পও রয়েছে ‘জল ধর, জল ভর’। এই প্রকল্পের কথা যত শোনা যায়, কাজ তত চোখে পড়ে না। বরং কলকাতা এবং আশপাশের শহরতলি অঞ্চলে জল না ভরে জলাভূমি ভরাট করার কাজ দ্রুতলয়ে এগিয়ে চলেছে প্রোমোটরদের উদ্যোগে। অবশ্যই পেছনে অদৃশ্য শক্তির হাত রয়েছে। কলকাতার ‘কিউনি’ বলা যে পূর্ব কলকাতা জলাভূমি, তা আজ জমি মাফিয়াদের দখলে। সরকার দৃশ্যমান কোনো ব্যবস্থা নিয়েছেন কি না জানা নেই।

নদী-রহিত সমুদ্রঘেরা আমাদের দেশের মুম্বই শহরেরও জল সরবরাহ মূলত লেকে সংরক্ষিত বৃষ্টির জলের উপর নির্ভরশীল।

এ প্রসঙ্গে একটি চমকপ্রদ উদাহরণ সামনে আনার লোভ সামলানো কঠিন।

চারদিকে নোনা জলের সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপরাষ্ট্র সিঙ্গাপুর। মাত্র ১৯৬৫ সালে স্বাধীন হওয়া দেশ এখন বিশ্বের উন্নত দেশগুলির প্রথম সারিতে। ওখানে দেশের যে কোনো প্রান্তের শৌচাগারের জলও নিরাপদ পানীয়। ভাবা যায়! ওখানে জলের প্রথম দৃশ্যমান উৎস কয়েকটি বিশালাকার দীঘি (Reservoir), যেখানে বৃষ্টির জল ধরে তা পরিশোধন করে সরবরাহ করা হয়। দীঘি সংরক্ষণে চূড়ান্ত সতর্কতা অবলম্বন করার সাথে সাথে সাধারণ নাগরিকদের সচেতন করার প্রয়াস ওপরে বিজ্ঞপ্তির ছবি দেখে আন্দাজ করা যায়। অবশ্য এ ছাড়াও ওদের আরো কিছু উপায়ে জলের জোগান দেয় যেমন মালয়েশিয়া থেকে কিছু আমদানি (Import), সমুদ্রের জল লবণ-মুক্তকরণ (Desalinisation) এবং সর্বোপরি ব্যবহৃত জল (নালা দিয়ে বয়ে যাওয়া)-এর পুনর্ব্যবহার (Recycling)। মজার ব্যাপার ও দেশে কোনো ওয়াটার ফিল্টার কোম্পানি নেই।

যাই হোক, পরিশেষে বলি—একটা প্রশ্ন আমার মাথায় পোকার মতো ঘুরঘুর করতে থাকে, ‘ওরা পারে, আমরা পারি না কেন?’ শুভেচ্ছাসহ।

চিত্ত সামন্ত। কলকাতা-১০৭

উমা

৩৩ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৬



WB/EC 228 ISSN 0971-5800 RN. 37375/80

Rs. 30.00

৪৭ তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৬

৩০.০০ টাকা

পুস্তক তালিকা

উৎস মানুষ পত্রিকা ও প্রকাশনার বইয়ের জন্য
যোগাযোগ— সুমন্ত বিশ্বাস।
ফোন— ৯৪৩৩৭৭১৫৭৭/৯৪৩৩০৩৬৫৩৩

উৎস মানুষ পত্রিকা ও প্রকাশনার বইগুলি অনলাইনে
অর্ডার দিলে পাওয়া যায়। যোগাযোগ—হারিত বুকস
(অনলাইন) haritbooks@gmail.com
হারিতের ফোন নং — +৯১ ৮৩৩৬৯৪১১০৮

বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা বাবদ কলকাতা ২৫০
টাকা/ কলকাতার বাইরে ৩০০ টাকা পত্রিকার
ব্যঙ্গ অ্যাকাউন্টে জমা দিতে হবে।

**Punjab National Bank,
College Street Branch,
Kolkata - 700073.
UTSA MANUSH, SB ACCOUNT NO.
0083010748838.
IFSC NO. PUNB0008320**

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়।
মোবাইল নম্বর সহ পুরো ঠিকানা পত্রিকার
ই-মেইলে অথবা হোয়াটসঅ্যাপে জানাতে হবে।
কোন সংখ্যা থেকে গ্রাহক হতে চান তা উল্লেখ
করতে হবে।

ওয়েবসাইট : <https://www.utsomanush.com>
ই-মেল : utsamanush1980@gmail.com
Facebook : <https://www.facebook.com/>

পাঁচমিশালি (সংকলন)	১২০.০০
জল-জমি-জঙ্গলের খোঁজে:	
বোলান গঙ্গোপাধ্যায়	১৫০.০০
স্বাস্থ্যের সাতকাহন ১ম খণ্ড : গৌতম মিস্ত্রী	২০০.০০
আসুন কাণ্ডজ্ঞানে ফিরি: আশীষ লাহিড়ী	৮০.০০
চেনা বিষয় অচেনা জগৎ: সমীরকুমার ঘোষ	১৫০.০০
বাঁধ বন্যা বিপর্যয় (সংকলন)	২০০.০০
আহরণ (সংকলন)	২০০.০০
যে গল্পের শেষ নেই: দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	১৮০.০০
প্রতিরোধ : সম্পা: (ঐ)	১৩০.০০
বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান (সংকলন)	২০০.০০
বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ (সংকলন)	২০০.০০
বিবেকানন্দ অন্য চোখে/সমীক্ষা ও আরো কিছু বিতর্ক	
নিরঞ্জন ধর	১২০.০০
প্রমিথিউসের পথে (সংকলন)	৫০.০০
লেখালিখি: অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়	২০০.০০
যুক্তিবাদের চার সেনাপতি	
অনু : প্রতুল মুখোপাধ্যায়	৬০.০০
শেকল ভাঙা সংস্কৃতি (সংকলন)	১২০.০০
গুমোট ভাস্কর গান: ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ	১৫০.০০
নিজের মুখোমুখি: রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	৭৫.০০
এটা কী ওটা কেন (সংকলন)	৫০.০০
মূল্যবোধ (সংকলন)	৮০.০০
প্রেসিডেন্ট বুশ-এর এই যুদ্ধ:	
অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়	৩০.০০
বাংলা বন্ধ বা শেষের শুরু:	
হিমালীশ গোস্বামী	৪০.০০

প্রাপ্তিস্থান : পাতিরাম, সেতু প্রকাশনী, ২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, অমর কোলে (বিবাদী বাগ), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ
ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), মনীষা গ্রন্থালয় (কলেজ স্ট্রীট), ক্রান্তিক (কলেজ স্ট্রীট), রথীনদা (গোলপার্ক), ন্যাশনাল বুক এজেন্সি
(সূর্য সেন স্ট্রীট)। জ্ঞান বিচিত্রা ১৮বি/১বি, টেমার লেন। প্রতিক্ষণ, ৫ সূর্য সেন স্ট্রীট।
হারিত বুকস (অনলাইন) haritbooks@gmail.com

উৎস মানুষ সোসাইটির পক্ষে বরণ ভট্টাচার্য কর্তৃক বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০ ০৬৪ থেকে প্রকাশিত
এবং দি নিউ জয়কালী প্রেস, ৮এ, দীনবন্ধু লেন, কলকাতা- ৭০০ ০০৬ হইতে মুদ্রিত।